চাঁদমামা
এপ্রিল ১৯৭৪
1 Re

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন ও স্ক্যান করেছেন : ঝাড়গ্রাম ডেভিলস

এডিট করেছেন : সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো অকল্পনীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com
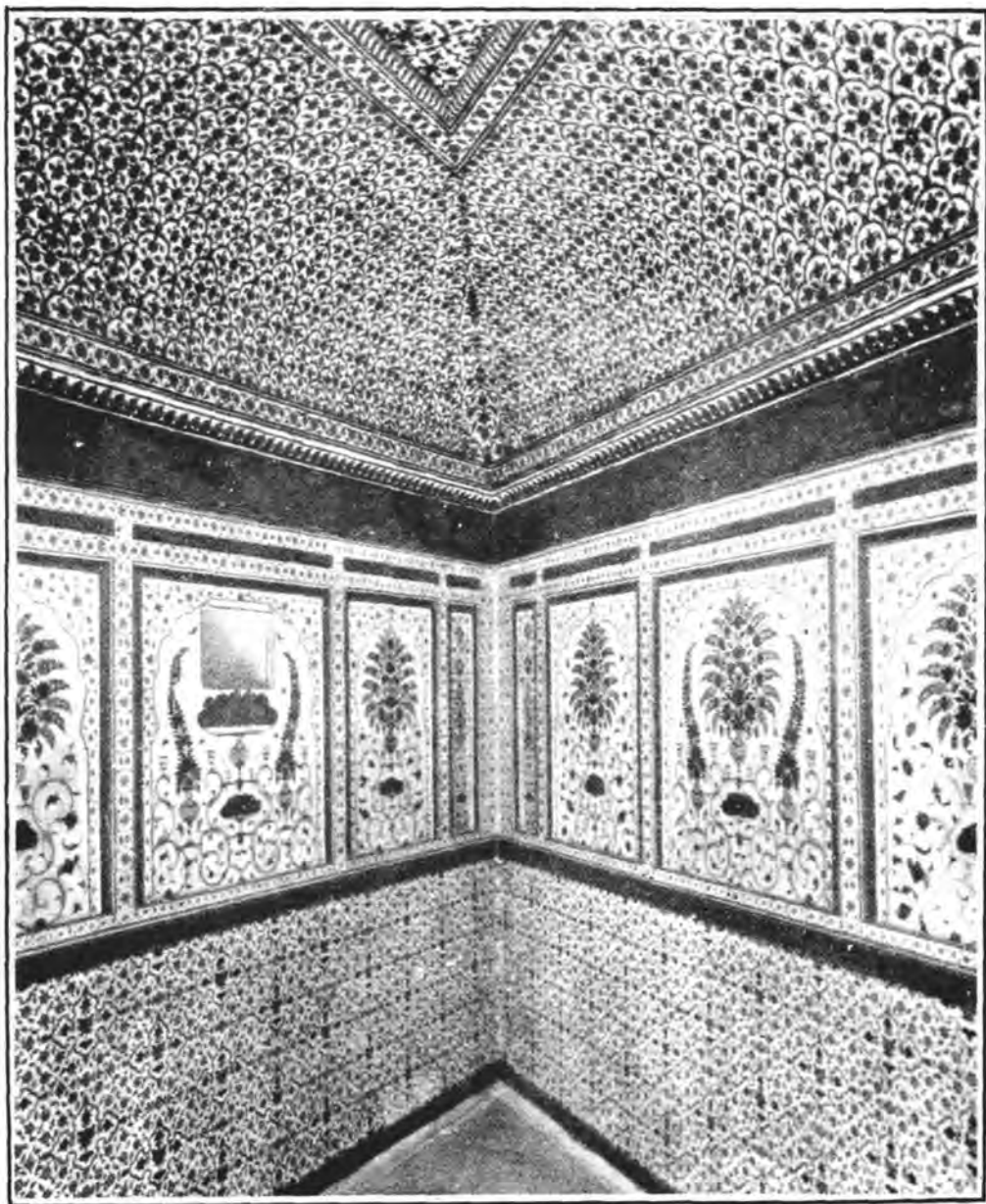
Photo by: A. L. SYED

পেটের গোলমাল?
সে আবার কি বাপু?
কোনদিন শুনিনিতো!
ডাবর
গ্রাইপ
ওয়াটার
প্রত্যেক মায়ের কাছে
তার শিশুর মতন প্রিয়
শিশুদের বদহজম, অম্বল, পেটব্যাথা, বায়ু, ও দাঁতউঠার সময় ব্যাথার একটি সুস্বাদু সুনিশ্চিত সমাধান
GRIPE
WATER
ডাবর (ডাঃ এস. কে. বর্ম্মন) প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

পুরস্কার বিজয়ী

প্রথম পুরস্কার: শ্রীউমেশ গুপ্ত, ৬বি/৬, উত্তরী মার্গ,
পুরাতন রাজেন্দ্র নগর, নয়াদিল্লী ১১০ ০৬০।

পুরস্কার বিজয়ীর বাক্য:
"I like Chiclets best because I make friends by just offering 'Chiclets' to others."

দ্বিতীয় পুরস্কার:

(১) শ্রীভি. নন্দকুমার. ১-১০-৩৬০, বেগমপেট, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০১৬

(২) শ্রীসুনীল কুমার বহল, ৫৩, টেগোর ভিলা, কনৌট প্লেস, দেরাদুন

(৩) শ্রীঅরুণ চোপরা, আর, ৬৯৬, নতুন রাজেন্দ্র নগর, নয়াদিল্লী ১১০ ০৬০

(৪) শ্রীআর. কৃষ্ণন, এ, ৮৮, ১২তম অ্যাভিন্যু, অশোক নগর, মাদ্রাজ ৬০০ ০৮৩

কুড়িটি ৩য় পুরস্কার বিজয়ীদের ডাকে জানানো হবে।

অভিনন্দন

পালন পোষণ যদি ঠিকমত চান তবে বাচ্চাদের বোর্নভিটা খাওয়ান!

পড়াশোনায় চৌকস....খেলাধুলায় ওস্তাদ

পড়াশোনায় বা খেলাধূলায় চাপে ছেলে-মেয়েদের যে শক্তির অপচয় হয়, তার পূরণ না হলে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ পূর্ণতা লাভ করে না। প্রতিদিন বোর্নভিটা খেলে শক্তির উৎস অফুরান থাকে।

বোর্নভিটায় আছে পুষ্টিকর **কোকো**, দুধ, মল্ট ও চিনি— তাই এটি এত সুস্বাদু :

শক্তি, উৎসাহ ও স্বাদের জন্য—
ক্যাডবেরিস্ বোর্নভিটা!

WIN any one of the 5 (Five) Cheques already drawn and kept in sealed covers in the custody of Canara Bank, Bangalore, by guessing the Cheque amount correctly. Fill in the Coupon below and mail your entry to the NATIONAL PRODUCTS, 135, Kaval Byrasandra, Bangalore-560006.

If there are no correct entries the nearest guess wins the prize. If there are more than one successful entries the Cheque amount will be shared amongst them.

You can send any number of entries as you desire but every entry form must be accompanied by 10 (ten) empty wrappers of NP Crackies Strip pack.

Entries close on May 31, 1974 and the result will be published in The July Issue of Chandamama.

NO CORRESPONDENCE WILL BE ENTERTAINED AND THE DECISION OF THE NP MANAGEMENT IS FINAL.

NP-MAC(B)

CUT HERE

NO ENTRY FEE

Fill in ink legibly

Corrections and overwritings disqualify the entries.

Contest strictly governed by the rules and regulations laid down.

NP CRACKIES CONTEST ENTRY FORM • LAST DATE 31-5-1974

Prizes	Cheque Numbers	Amount of the cheque is between	FILL IN Your guess of the cheque amount Rs.	P
I	508183	Rs. 1501 and 2000		Nil
II	508184	1001 and 1500		Nil
III	508185	751 and 1000		Nil
IV	508186	501 and 750		Nil
V	508187	251 and 500		Nil

Name ______________________ Age ______

Address: ______________________

____

Date ____________ Signature of the contestant ____________

রাম আর শ্যাম শিকারেতে চলে...

রাম-শ্যামকে শিকার করার নেশায় চেপে ধরে,
দুই বন্ধু আফ্রিকাতে চলে জোট করে।

দুই জনকে স্বাগত জানায় গ্রামের দলপতি,
সে দেখবে যেন ওদের হয়না কোন ক্ষতি

জঙ্গলেতে দুই বন্ধুর চলল শিকার খোঁজা,
হাতীর পিঠে ঘোরাঘুরির মিললো দুশো মজা

বাঁদরেরা দল বেঁধে সব ঝুলছে গাছে গাছে, কিচির মিচির হল্লা জুড়ে এডাল ওডাল নাচে

রাম-শ্যামকে দেখতে পেয়ে অমনি তারা ছোটে,
গাছের ফল ফেলে দিয়ে ওদের ঘিরে জোটে

মিষ্টি ফলার পেয়ে ওরা ফল খেতে যায় ভুলে,
হাসিখুশী পপিন্স নিয়ে নাচে দু'হাত তুলে

খেতে ভাল·দেখতে ভাল·ভাবতে ভাল

পার্লে পপিন্স

ফলের স্বাদে ভরা লজেন্স

৫ রকম ফলের স্বাদে ভরপুর
রাস্পবেরী, আনারস, লেবু,
কমলালেবু ও মৌসম্বী।
প্রত্যেক প্যাকেটে ১৩টি লজেন্স।

everest/547/PP ben

চাঁদমামা

সংস্থাপক : বি. নাগি রেড্ডি
নিয়ন্ত্রণ : চক্রপাণি

এ মাসের বেতাল কথা একটি নীতি-মূলক কাহিনী। অন্যের বিরুদ্ধে দ্বেষ বা ঘৃণা পোষণ করার আগে নিজের মনে প্রশ্ন জাগে। মন সেই সব প্রশ্নের জবাব খোঁজে। যতক্ষণ না গরিবের মনে নিজের দরিদ্র অবস্থার প্রতি ঘৃণা জাগছে তত-ক্ষণ গরিব কখনই ধনীর বিরুদ্ধে ঘৃণা পোষণ করতে পারে না। গোলাম যত-ক্ষণ না নিজের গোলামীকে ঘৃণা করছে ততক্ষণ সে তার প্রভুর বিরুদ্ধে ঘৃণা পোষণ করতে পারে না। প্রভুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে না।

খণ্ড ২ এপ্রিল ১৯৭৪ সংখ্যা ১০

অমর বাণী

বিদ্যা নেব বিজানাতি বিদ্বজ্জন পরিশ্রমম্,
ন হি বন্ধ্যা বিজানাতি গুর্বীম্ প্রসববেদনাম্।   ॥ ১ ॥

[বিদ্বানদের পরিশ্রম বিদ্বানরাই বোঝে, ভয়ঙ্কর প্রসব বেদনা বাঁজা মেয়ে কি করে বুঝবে।]

বিদ্যাণাম নরস্য রূপমধিকম্, প্রচ্ছন্ন গুপ্তম্ ধনম্,
বিদ্যা ভোগকরী, যশস্সুখকরী, বিদ্যাণাম্ গুরুঃ,
বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশগমনে, বিদ্যা পরা দেবতা,
বিদ্যা রাজসু পূজ্যতে, ন হি ধনম্, বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ।   ॥ ২ ॥

[বিদ্যা মানুষের জীবনে সৌন্দর্য, গুপ্তধন, ভোগ, যশ ও সুখ প্রদান করে। বিদ্যা গুরুর গুরু। বিদেশে বন্ধুর মত। রাজাও তার পূজা করে, ধনের জন্য করে না। তাই বিদ্যাহীন মানুষ বিচিত্র পশুর সমান।]

বিত্তম্, বন্ধু, বয়ঃ কর্ম, বিদ্যা ভবতি পঞ্চমম্,
এতানি মান্যস্থানাণি তুরিয়ো যদ্য ছুত্তরম্।   ॥ ৩ ॥

[সমাদর করার যোগ্য ধন, বন্ধু, বয়, কর্ম ও বিদ্যা নামক পাঁচটির মধ্যে যথাক্রমে একে অন্যের চেয়ে ভাল।]

যক্ষপর্বত

একুশ

[পাহাড়ের উপর তৈরি দুর্গের কাছে যে ঘোড়সওয়ার বাহিনী বীরপুর থেকে এসেছিল তাদের কাছে স্বর্ণাচারি পরাজিত হয়ে কয়েকজন উট-যোদ্ধাদের নিয়ে পালাল। বনে সে খড়্গবর্মা, জীবদত্ত ও সমরবাহুর সাক্ষাৎ পায়। গুরু-ভালুক তখন তার এক শিষ্যের গুরু-ভক্তির পরীক্ষা নিচ্ছিল। তারপর···]

গুরু-ভালুকের শিষ্য গাছ থেকে লাফ দিতেই জীবদত্ত গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সেই শিষ্যকে ধরে ফেলল দণ্ড উঁচিয়ে। ভালুক জাতের ঐ শিষ্য মাটিতে পড়ার আগে ঐ দণ্ডের উপর পড়ল। পরক্ষণেই জীবদত্ত তাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল।

এর ফলে ঐ ভালুক যুবক কোন আঘাত পায়নি। নিজের গুরু-ভক্তির প্রমাণ দিতে না পারায় দুঃখ পেয়ে সে জীবদত্তকে বলল, "মশাই, আপনি আমাকে ধরে ফেলে প্রাণে বাঁচিয়েছেন বটে তবে আমার স্বর্গে যাওয়ার পথও আপনি রুদ্ধ করে দিলেন। এতে আমার ক্ষতি হল।"

তার কথা শুনে জীবদত্ত হেসে বলল, "আরে ভাই কে বলতে পারে তুমি এই গাছ থেকে নিচে পড়ে স্বর্গে যেতে না

নরককে ? যাই হোক, তুমি গাছ থেকে লাফ দিয়ে প্রমাণ করে দিলে যে তুমি গুরুর নির্দেশকে দেবতার নির্দেশের মত মেনে চল। তোমাকে যে বাঁচালাম তার একটা উদ্দেশ্য আছে। ভবিষ্যতে তোমার গুরুকে এবং সমরবাহুকে তোমার সাহায্য করতে হবে।"

ততক্ষণে সেখানে গুরু-ভালুক, সমরবাহু ও খড়্গবর্মা পৌঁছে গেল। গুরু-ভালুক খুশী হয়ে খড়্গবর্মা ও জীবদত্তকে বলল, "আপনারা আমার শিষ্যদের গুরু-ভক্তির পরিচয় পেলেন তো! এখন আপনারা আমার শিষ্যদের যে কাজে ব্যবহার করতে চান করতে পারেন। সমরবাহু যদি এই বনাঞ্চলের রাজা হন তো আমার সুড়ঙ্গে যে বৃকেশ্বরী দেবী আছেন তার পূজা নিয়মিত চলবে বলেই আমার ধারণা। আমি চাই প্রতিদিন পূজা হোক। এছাড়া আর কিছুই আমি চাই না।"

"ভালুক! এই দেবীর পূজার নামে যাতে কোন রকম প্রাণী হত্যা না হয় তা দেখার ভার সমরবাহুর উপর থাকবে।" একথা বলে জীবদত্ত গুরু-ভালুকের শিষ্য-দের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই গাছ থেকে ঝাঁপ দেওয়া লোকের সঙ্গে আর একজন এস আমার কাছে। আমি এই দুজনের উপর একটা কাজের ভার দেব। ঐ কাজ সেরে ফিরতে হবে।"

গুরু-ভালুক নিজের শিষ্যদের একজনকে কাছে ডেকে গাছ থেকে লাফ দেওয়া লোকটার কাছে দাঁড় করিয়ে দিল। তখন জীবদত্ত ঐ দুজনকে ধরে উচ্চস্বরে বলল, "শোন, তোমাদের দুজনকে একটা কাজ করে ফিরে আসতে হবে। এই কাজ করতে গিয়ে তোমাদের যদি জীবন যায় যাবে তবে কাজটা খুব গোপনে করতে হবে। কাক-পক্ষীও যেন টের না পায়। দেখ, সামনের ঐ বনে বীরপুরের সেনারা কোথাও আছে। তোমরা হঠাৎ তাদের কাছে গিয়ে এমন হাবভাব দেখাবে যেন অজান্তে তাদের কাছে পৌঁছে গেছ।

তাদের হাতে পড়ে যাওয়ার মত ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলবে যে সমরবাহুর সমস্ত সৈনিক গুরু-ভালুকের সুড়ঙ্গে ঢুকে আছে। বুঝতে পারলে?"

"আজ্ঞে এ আর এমন কি শক্ত কাজ। এতো শুধু আমাদের গুরুর কাজই নয়, আমাদের রাজারও কাজ। আমরা বীর-পুরের ঘোড়সওয়ারদের সঙ্গে দেখা করব। মেলামেশা করব। তারপর আপনি যে ভাবে বললেন সেইভাবে সব করব। আপনি আমাদের উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন। আমরা আপনার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।" গুরু-ভালুকের শিষ্যদ্বয় বলল।

"তাহলে আর দেরি কেন, ঝটপট রওনা হয়ে যাও।" জীবদত্ত বলল।

ঐ দুজন শিষ্য তারপর নিজেদের গুরুর সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। গুরু-ভালুক তাদের কানে কানে বলল, "ওরা গুপ্তচর ভেবে তোমাদের মেরে ফেলার হুমকি দেবে, মৃত্যুভয়ও দেখাবে তবু তোমরা কিন্তু আসল রহস্য ভেদ করো না। বুঝতে পেরেছ আমার কথা?"

গুরু-ভালুকের ঐ শিষ্য দুজন মাথা নিচু করে বলল, "গুরু-ভালুক, আপনার নির্দেশকে বৃকেশ্বরী দেবীর নির্দেশ মনে করি।" বলে ওরা দুজন বেরিয়ে পড়ল।

ঐ দুজনে অনেকক্ষণ বনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। শেষে ওরা এক গাছের নিচে বীরপুরের ঘোড়সওয়ারদের দেখতে পেল। চারজন ঘোড়সওয়ার ঘোড়া থেকে নেমে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। ওরা স্বর্ণাচারির অনুচরদের খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

ওদের দেখে গুরু-ভালুকের অনুচর দুজন নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করে কথা বলে হঠাৎ চিৎকার করতে লাগল, "গুরু-ভালুক! তুমি কোথায়? আমরা এখানে।"

ওদের চিৎকার কানে যেতেই গাছের নিচের ঘোড়সওয়ার সেনারা চমকে উঠল। ঝট করে খাপ থেকে তরবারি বের করে

ওদের নেতা বলল, "এ কাদের চিৎকার? আমরা কয়েকদিন আগে শুনেছিলাম না ভালুক জাতের লোকের কথা? মনে হচ্ছে এ ওদেরই কণ্ঠস্বর। আমাদের সামনে আর এক বিপদ দেখা দিয়েছে। চলো, এগিয়ে দেখা যাক। কে জানে ওরা কতজন আছে। খুব সাবধানে এগোতে হবে। কে জানে ওদের হাতে কোন্ অস্ত্র আছে। কোন্ মতলবে চিৎকার করেছে তাওতো আমরা জানি না। চল।"

ঘোড়সওয়ার সেনারা কাছে আসতেই ভালুক জাতের ঐ দুজন শিষ্য হাতের তরবারি নিচে রেখে দিয়ে বলল, "মশাই, আমাদের মেরে ফেলবেন না। আমরা আপনাদের অধীনে থাকতে চাই। মনে হচ্ছে আমাদের গুরু শত্রুর কবলে পড়ে গেছে। গুরুই যখন নেই তখন আর আমাদের থাকার কী বা সার্থকতা! বাঁচার আর কোন মানে হয় না।"

অশ্বারোহীদের নেতা কি করবে, কি বলবে ঠিক করতে পারল না কিছুক্ষণ। পরে বলল, "আচ্ছা, তোমাদের গুরুকে শত্রু নিয়ে গেছে? কে সেই শত্রু?"

ভালুক শিষ্যদের একজন বলল, "হুজুর, কি বলব সেই বিপদের কথা। আজ ভোরে উটে চড়ে কিছু লোক হঠাৎ আমাদের সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়েছিল। আমরা তখন দেবীর পূজায় মগ্ন ছিলাম। এর ফলে আমরা এই অতর্কিত আক্রমণের মোকাবিলা করতে পারিনি। ফলে ওদের হাতে আমাদের বহুলোক মারা গেছে। ওদের হাত থেকে কোন রকমে রক্ষা পেয়ে আমাদের কয়েকজন গুরুর সঙ্গে সেই সুড়ঙ্গ থেকে পালিয়ে এসেছি। কিন্তু আমরা এখন গুরুর খোঁজ পাচ্ছি না। আমরা আমাদের গুরুকে খুঁজছি। গুরু ছাড়া আমাদের জীবনের কোন মূল্য নেই। জীবন বৃথা।"

ভালুক জাতের লোকের মুখে এই কথা শুনে বীরপুরের দলের নায়কের মনে হল, এ নিশ্চয় স্বর্ণাচারির কাণ্ড। পাহাড়ী

দুর্গের উপর আমরা যে আক্রমণ চালিয়েছিলাম তা সহ্য করতে না পেরে পালিয়েছিল। স্বর্ণাচারির নেতৃত্বে শেষে ওরা ঐ সুড়ঙ্গ দখল করেছে। এসব কথা ভেবে সে কয়েকজন অনুচরকে ঐ পাহাড়ের কাছে যে সেনাপতি রয়েছে তার কাছে তাদের যেতে বলল। ওরা রওনা হতে যাবে এমন সময় বীরপুরের ঐ নেতা বলল, "শোন, তোমরা দুজন তাড়াতাড়ি আমাদের সেনাপতিকে গিয়ে বল যে স্বর্ণাচারি এক সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকিয়ে আছে। আমাদের কর্তব্য এখন কি হবে জেনে এস। যাও।" ওরা চলে গেল।

তারপর অশ্বারোহী নেতা ভালুক শিষ্যদের বলল, "তোমরা দুজনে আমাদের বড় উপকার করলে। আমরা খুঁজছিলাম আমাদের ঐ শত্রুকে। আমাদের সেনাপতি এসে গেলেই আমরা তোমাদের উপহার দেব।"

উপহারের কথা শুনে ঐ শিষ্য দুজন অনিচ্ছা প্রকাশ করে বলল, "আজ্ঞে আমরা দেবীর উপাসক। আমাদের উপহারের কোন দরকার হয় না। আমরা আমাদের গুরুর সন্ধান পেয়ে গেলেই খুশী। এছাড়া আমরা আর কিছুই চাই না। আচ্ছা, এবার আমরা যাই। গুরুর খোঁজ করি।" বলে ওরা দুজনে এগিয়ে গেল।

দলের নেতা হঠাৎ ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে এসে ওদের মধ্যে একজনকে ধরে রেগে গিয়ে গর্জে উঠে বলল, "দাঁড়াও, কোথায় যাচ্ছ? সুড়ঙ্গ দুর্গ কোথায় আছে আমরা জানব কি করে? ওটা দেখানোর ভার তোমাদের বুঝলে?"

"হুজুর, সুড়ঙ্গ দুর্গ এখান থেকে বেশি দূরে নেই। একটা সোজা পথ আছে, সেই পথ একেবারে দুর্গের ভিতরে চলে গেছে। আমরা সেই পথ আপনাদের দেখিয়ে দেব। তবে দয়া করে সুড়ঙ্গের ভিতরে যদি ওরা আমাদের গুরুকে আটকে রেখে থাকে আপনারা দয়া করে ছাড়িয়ে দেবেন।" একজন ভালুক শিষ্য বলল।

"ঐ দুর্গ অধিকার করার পর কে যে রাজদ্রোহী আর কে যে রাজহিতৈষী তা বিচার করার ভার আমাদের সেনাপতির। আমরা সবাই মিলেই ঐ সুড়ঙ্গের ভিতর যাব। তোমরা দুজনে ততক্ষণ এই গাছের নিচে বিশ্রাম কর।" দলের নেতা বলল।

দুজন অশ্বারোহী সেনাপতিকে জানাল যে স্বর্ণাচারিরা পাহাড়ী অঞ্চল থেকে পালিয়ে সুড়ঙ্গে লুকিয়ে রয়েছে। শুনে সেনাপতি বলল, "তার মানে সমস্ত রাজ-দ্রোহী এক জায়গায় জড় হয়েছে। ভালই হল, ওদের সবাইকে বন্দী করে প্রকাশ্য রাজপথে ঘোরাব। তারপর ওদের সবাইকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেব। এসব যারা দেখবে তারা জীবনে আর কোনদিন দেশদ্রোহী হওয়ার সাহস পাবে না।"

তারপর সেনাপতি, অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনাদের নিয়ে ঐ নেতার কাছে গেল। ওদিকে খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত অনুমান করেছিল যে ভালুক শিষ্যদের কথা বিশ্বাস করে বীরপুরের সেনারা সুড়ঙ্গ দুর্গ দখল করতে আসবে। তাই তারা সমরবাহু, গুরু-ভালুক ও অন্যদের নিয়ে সুড়ঙ্গের কাছে অপেক্ষা করতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বীরপুরের সেনাপতি ও দলনায়কের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হল। দলনায়ক সেনাপতিকে গুরু-ভালুকের শিষ্যদের দেখিয়ে সমস্ত ঘটনা জানাল। সে বলল, "ঐ সব রাজদ্রোহী আমাদের জালে পড়ে যাবে।"

সেনাপতি ভালুক-শিষ্যদের দিকে তর-বারি উঁচিয়ে বলল, "ওরে এই দুষ্টেরা, তোমরা সত্যি কথা বলছ তো? নাকি তোমাদের গুরুর কৌশল খাটাতে এসেছ?"

ভালুক-শিষ্যরা তরবারি দেখে একটুও বিচলিত হল না। তারা বুক টান করে বলল, "হুজুর, আমরা যা বলেছি তা স্বয়ং বৃকেশ্বরী দেবীর বাণী। আপনারা ঐ উট জাতের অত্যাচারীদের হাত থেকে অবিলম্বে অনুগ্রহ করে আমাদের উদ্ধার করুন। আমাদের কথা বিশ্বাস করুন। আপনারা

ওদের মেরে ফেলে আমাদের হাতে ঐ সুড়ঙ্গ দিয়ে দিন। আমাদের গুরুকে ঐ সুড়ঙ্গ পাইয়ে দিন।"

"আরে, আগে ঐ সুড়ঙ্গ উদ্ধার তো করি, তারপর ভেবে দেখব কার হাতে ওটা তুলে দেওয়া উচিত।" সেনাপতি বলল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিজের সেনা-দের বলল, "শোন, আমরা নীরবে ভালুক জাতের দুর্গের কাছে যাব। আরে এই উল্লুক ভালুকরা, তোমরা সামনে থাকবে। পথ দেখাবে। আর শোন, তোমরা যদি কোনভাবে আমাদের ধোকা দিতে চেষ্টা কর তাহলে তোমাদের আস্ত রাখব না। টুকরো টুকরো করে ফেলব।"

ভালুক শিষ্যরা পথ দেখাতে দেখাতে হাঁটছিল। ওদের পিছনে সেনাপতি ও সেনারা হেঁটে আধ ঘণ্টা পরে ঐ দুর্গের কাছে পৌঁছাল। সেই সময় সুড়ঙ্গ দুর্গের কাছে কোন লোক ছিল না। দুর্গের মুখে গাছপালা, কাঁটা গাছের ঝাড় ছড়ানো ছিল। সেনাপতি প্রথমে ঘোড়া থেকে নাবল। চারদিকে কঠিন নীরবতা। একটি পাখিও ডাকছে না।

সেনাপতি প্রথমে ঘোড়া থেকে নেবে দুর্গের মুখের কাছে গিয়ে উচ্চস্বরে ডাকল, "ওহে সুড়ঙ্গে লুকোনো কাপুরুষের দল! শোন, আমি বীরপুরের সেনাপতি এসেছি।

বহু সেনা নিয়ে এসেছি। দু-তিন মিনিটের মধ্যে তোমরা হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে খালি হাতে সুড়ঙ্গের বাইরে এস। তা যদি না আস তাহলে সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢুকে তোমাদের সবাইকে শেষ করে ফেলব।"

কিন্তু সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে কোন সাড়া শব্দ এল না। দু-চার মিনিট অপেক্ষা করে সেনাপতি দাঁতে দাঁত পিষে ঘোড়-সওয়ারদের ঘোড়াগুলোকে বেঁধে তার কাছে আসার নির্দেশ দিল। ঘোড়াগুলোকে পাহারা দেবার জন্য লোক বসানো হল। তারপর সেনাপতি ঐ দুজন ভালুক-শিষ্যকে বলল, "ওহে, আমরা এখন সুড়ঙ্গে ঢুকব। তোমরা দুজন সামনে থাক। পথ দেখাও।"

ভালুক-শিষ্যরা রাজী হল। সুড়ঙ্গে ঢুকল। ওদের পেছনে সেনাপতি ও সৈনিকরা গেল। ওদের সকলের সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢুকে যাবার পর হঠাৎ সুড়ঙ্গের মুখের ঝোপঝাড়ের ভিতর থেকে চারজন ভালুক জাতের সেনা ঝটপট বেরিয়ে এল। ওরা মুহূর্তে বীরপুরের যে দুজন সেনা ঘোড়াগুলোকে পাহারা দিচ্ছিল তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বল্লম দিয়ে তাদের মেরে ফেলে ঝোপে ফেলে দিল।

ঠিক সেই সময় জীবদত্ত, সমরবাহু ও গুরু-ভালুককে নিয়ে সেখানে এসে বলল, "দেখ গুরু-ভালুক বীরপুরের ঐ দুই সেনাকে মেরে ফেলা তোমার শিষ্যদের উচিত হয়নি। ওদের হাত-পা বেঁধে ঝোপে ফেলে রাখলেই পারত।"

"গুরু-ভালুক এই কথার কোন জবাব না দিয়ে শুধু মাথা নাড়ল। সমরবাহু অতগুলো ঘোড়াকে দেখে আনন্দিত হয়ে চিৎকার করে বলল, "জীবদত্ত, আমাদের এতগুলো ঘোড়া পেয়ে খুব ভাল হল।"

"ঘোড়া পেয়েছ ঠিক তাই বলে ভেব না যে আমরা শত্রুমুক্ত হয়েছি। বুঝলে সমর-বাহু, আমাদের এখন সমস্যা হল কি করে বীরপুরের সেনাপতিকে জ্যান্ত ধরা যায়। অবশ্য ওদের ভয় পাইয়ে দেওয়ার একটি উপায় আছে। সুড়ঙ্গের মুখে যে গাছপালা ফেলা আছে তাতে আগুন ধরানো "

ভালুক জাতের লোক ও সমরবাহুর অনুচররা আরও কাঠ জড়ো করে সুড়ঙ্গের মুখে আগুন ধরিয়ে দেবার আগে জীবদত্ত চিৎকার করে বলল, "হে বীরপুরের সেনা-পতি, তুমি এবং তোমার সেনা হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে দু-তিন মিনিটের মধ্যে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এস। তোমরা বেরিয়ে না এলে রাজা সমরবাহু ও বনবাসী যুবকেরা সুড়ঙ্গে ঢুকে তোমাদের হত্যা করবে।"

(আরও আছে)

পুরুষদ্বেষিণী

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য আবার গেলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নাবিয়ে কাঁধে ফেলে যথারীতি শ্মশানের দিকে নীরবে এগোতে থাকেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, "রাজা, তোমার পরিশ্রম দেখে আমার মনে হচ্ছে তুমিও বিশ্বমিত্রের মত কোন নারীর হিংসার শিকার হয়ে গেছ। বিশ্বমিত্রের কাহিনী শুনলে তোমার পরিশ্রম লাঘব হবে।"

বেতাল কাহিনী শুরু করল: প্রাচীন কালে শ্রীপুরে বিশ্বমিত্র নামে এক ধনী যুবক ছিল। তার স্বভাব ছিল উদার, মন ছিল প্রশান্ত। কিশোর বয়সেই তার মা বাবা মারা গেল। ফলে তার নিকট আত্মীয়রা তাকে লালন পালন করে বড় করল এবং বিয়ে দিল পাশের গাঁয়ের এক সুন্দরী কন্যার সঙ্গে।

বেতাল কথা

বিশ্বমিত্রের স্ত্রী মিত্রবিন্দু খুব সুন্দরী ছিল বটে তবে ওদের দুজনের মধ্যে বনিবনা ছিল না। কথায় কথায় ওদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া লাগত। বিশ্বমিত্র মিত্রবিন্দুর গায়ে হাত দিলে তার মনে হত তার গায়ে যেন সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রথম প্রথম বউয়ের আচরণ দেখে তার মনে হত তার বাবা মা বুঝি জোর করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্বমিত্রের এই ধারণা যে ভুল তা সে টের পেল। মিত্র-বিন্দু শুধু যে তার স্বামীকেই ঘৃণা করে তাই নয় গোটা পুরুষ জাতিকেই ঘৃণা করে।

একবার কথায় কথায় মিত্রবিন্দু বলল, "পুরুষ মাত্রেই ভূতের মত লেগে থাকে। কোন বুদ্ধিমতীর উচিত নয় বিয়ে করা। নেহাৎ বাবা মা দুঃখ পাবে তাই, না হলে আমি বিয়ে করতাম না।

তার কথা শুনে বিশ্বমিত্র মনে মনে ভাবল বউয়ের এই ভুল ধারণা যে কোন ভাবে দূর করতে হবে। আর একবার ভুল ধারণা দূর করতে পারলে মিত্রবিন্দুর মনে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। এই সব কথা ভেবে বিশ্বমিত্র নানান ধরণের চেষ্টা করতে লাগল। মিত্রবিন্দুকে খুশী করার সমস্ত রকম চেষ্টা করেও যখন ব্যর্থ হল ঠিক সেই সময় মিত্রবিন্দুর মধ্যে মা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। তখন বিশ্বমিত্র ভাবল বাচ্চা হওয়ার পরে নিশ্চয়ই মিত্রবিন্দুর মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেবে।

যথাসময়ে মিত্রবিন্দুর যমজ সন্তান হল। যমজ সন্তান হওয়ার পরে মিত্রবিন্দুর মনে পরিবর্তন দেখা দেওয়া দূরে থাক সে বিশ্বমিত্রের প্রতি আরও বেশী ঘৃণা পোষণ করতে লাগল। সে খালি ভাবত বিশ্বমিত্র তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাকে আরও অসুবিধায় ফেলতে চায়। সে স্বামীকে দেখেই চটে যা মুখে আসত তাই বলত।

স্ত্রীর কাছ থেকে এতটা রুক্ষ ব্যবহার পেয়ে বিশ্বমিত্র বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে ঠিক করল। ভাবল সে বাড়ি থেকে চলে গেলে হয়তো মিত্রবিন্দুর মনে পরিবর্তন

দেখা দিতে পারে। ভেবে ভেবে শেষে একদিন বিশ্বমিত্র বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

যেতে যেতে অরণ্যের এক প্রান্তে এক সিদ্ধ যোগীর সাক্ষাৎ পেল। সেই যোগী বিশ্বমিত্রকে বলল, "বাবা, তোমার যদি তাড়া না থাকে আমার কাছে একটু দাঁড়াও। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি দেহত্যাগ করব। কিন্তু তার আগে আমি তোমাকে কামরূপ বিদ্যা দান করে যেতে চাই। এই বিদ্যা শিখে আমার দেহত্যাগের পর এই দেহটাকে পুড়িয়ে তুমি তোমার পথে চলে যাবে।"

বিশ্বমিত্র সিদ্ধ যোগীর কথামত কাজ করতে রাজী হল। যোগী খুশী হয়ে বিশ্বমিত্রকে কামরূপ বিদ্যা দান করে প্রাণত্যাগ করল। বিশ্বমিত্র সেখানেই কাঠ সাজিয়ে চিতা তৈরি করে যোগীর মৃতদেহ দহন করল। তারপর বিশ্বমিত্র বিলম্ব না করে শ্রীপুরে ফিরে এল।

বিশ্বমিত্র নিজের গাঁয়ে যখন ফিরল তখন রাত গভীর হয়ে গিয়েছিল। সে তখন কামরূপ বিদ্যার প্রয়োগ করে নারী-রূপ ধারণ করল। নারীরূপ ধরে তার বাড়ির সামনের বাড়ির কড়া নাড়ল। সে বাড়িতে থাকত দেবদত্ত নামে এক যুবক।

দেবদত্তের ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম ঘুম চোখে দরজা খুলে দেবদত্ত দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক অপ্সরা, অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতীকে দেখে দেবদত্তের ঘুম ছুটে গেল।

"আমার নাম সুমিত্রা। আমি দূর দেশ থেকে পথ হারিয়ে এখানে এসেছি। মা বাবা থাকলে পথ হারাতাম না। কিন্তু আমাদের উপর হঠাৎ ডাকাত দল ঝাঁপিয়ে পড়ায় এই অবস্থায় পড়েছি। ডাকাতরা বড় নিষ্ঠুর। আমার বাবা মাকে আমারই চোখের সামনে মেরে ফেলেছে। আমাকে মেরে ফেললেই পারত। এই রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করতাম না। এই রাতের মত দয়া করে আপনি আমাকে থাকতে দিন কাল সকালেই চলে যাব।" নারীরূপ ধারণকারী বিশ্বমিত্র বলল।

"এখানে এসে আপনি ভাল করেছেন। নিরাপদে থাকতে পারবেন। কোন ভয় নেই আপনার। নিশ্চয় আপনি থাকুন। রাতটা কাটিয়ে যান। কিন্তু আমি ভাবছি, কাল আপনি কোথায় যাবেন। আবার কোন খারাপ খপ্পরে পরে যাবেন। এবার হয়ত ডাকাতরা আপনাকেই ধরে নিয়ে যাবে। তার চেয়ে আপত্তি না থাকলে আমাকে বিয়ে করতে পারেন।" দেবদত্ত ভদ্রভাবে নিবেদন করল।

সুমিত্রা রাজী হল। পরের দিন শাস্ত্র-সম্মত ভাবে দুজনের বিয়ে হল। কিছু দিনের মধ্যেই মিত্রবিন্দু ও সুমিত্রার মধ্যে বন্ধুত্ব হল। সুমিত্রা মিত্রবিন্দুর বাচ্চাদের খুব ভালবাসত। সব সময় ঐ দুটি বাচ্চাকে আদর করত, খেলাত, খাইয়ে দিত। ঐ বাচ্চারাও নিজের মার কাছে থাকার চেয়ে সুমিত্রার কাছেই থাকতে বেশী ভালবাসত।

সুমিত্রা মিত্রবিন্দুকে কথায় কথায় নিজের স্বামী দেবদত্তের কথা বলত। স্বামীর সুখ সুবিধার দিকে যে সতর্ক দৃষ্টি রাখে সেকথাও মিত্রবিন্দুকে বলত। সুমিত্রার রূপ ধারণ-কারী বিশ্বমিত্র লক্ষ্য করল, মিত্রবিন্দুর মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে দেখে সে খুশী হল।

একবার মিত্রবিন্দু সুমিত্রাকে বলল, "তুমি বেশ সুখে আছ। আমি বোধহয় যা হারিয়েছি তা আর ফিরে পাব না।"

এই কথার জবাবে সুমিত্রা বলল, "কদিন ধরে জিজ্ঞাসা করব করব ভাবছি কিন্তু

পাছে তুমি ভুল বোঝ তাই আমি জিজ্ঞেস করিনি। আচ্ছা এই বাচ্চাদের বাবা কোথায় গেছেন ? কবে ফিরবেন ?"

মিত্রবিন্দুর চোখ জলে ভরে গেল। সে বলল, "উনি যে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন তার জন্য আমিই দায়ী। ফিরবেন কিনা কে জানে।"

তার এই কথা শুনে সুমিত্রার রূপ ধারণকারী বিশ্বমিত্র বুঝল যে তার স্ত্রীর মনে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। তারপর সে কামরূপ বিদ্যার মাধ্যমে নিজের রূপ ধারণ করে বিশ্বমিত্র বউকে সব কথা বুঝিয়ে বলল। কিছুক্ষণ মিত্রবিন্দুর দিকে তাকিয়ে বিশ্বমিত্র আবার বলল, "এখন আমি খুব ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছি যে নারীর জীবনে স্বামী এবং সন্তান অপরিহার্য। তোমার ব্যবহারের ফলে নারী জাতির উপর ঘৃণা জাগত। ভাগ্যিস আমি কামরূপ বিদ্যা শিখেছিলাম !"

মিত্রবিন্দু আনন্দে দুঃখে অনুতাপে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলল, "সত্যি আমার জন্য আপনার কষ্টের সীমা নেই। আপনি যে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন তার জন্য আমিই দায়ী। আপনি এত কষ্ট করতে গেলেন কেন ? ইচ্ছে করলে তো আপনি আমার চেয়েও অনেক বেশী সুন্দরীকে বিয়ে করতে পারতেন।"

"অন্যকে বিয়ে করার ইচ্ছে থাকলে আমি বাড়ি ছেড়ে বনে যেতাম কেন ? আমার মনে জিদ চেপেছিল যে কোন ভাবে তোমার মনের পরিবর্তন করতে হবে। এখানে থেকে আমি অনেক চেষ্টা করেও সফল হতে পারিনি। তাই নিজের উপর বিরক্তি জেগেছিল। চলে গিয়েছিলাম বনে। তারপর যা ঘটল সব তো বলেছি।" বলল বিশ্বমিত্র।

এর পর থেকে বিশ্বমিত্র ও মিত্রবিন্দু বাকি জীবন একসঙ্গে সুখে কাটাল।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "রাজা, এই বিশ্বসংসারে অনেক জীব আছে। বিশ্বমিত্র অন্য কোন রূপ ধারণ

না করে একটি নারীর রূপ ধারণ করল কেন? নারীর রূপ ধারণ করে একেবারে নিজের বাড়ির কাছে গেল কেন? অন্য পুরুষের সাহচর্য না পেয়েই মিত্রবিন্দুর মনে পুরুষের প্রতি মতের পরিবর্তন দেখা দিল কেন? এই সব প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও যদি না দাও তবে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

এই কথার জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, "নারী ও পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক। পুরুষ ছড়ে নারী, নারীকে ছেড়ে পুরুষ যদি থাকে তাহলে তাদের জীবন পূর্ণ হয় না। নারী ও পুরুষের সম্মিলিত জীবন যাপনের ফলেই সৃষ্টির অনুবর্তন। মিত্রবিন্দুর মনে শুধু যে পুরুষের প্রতি হিংসা বা দ্বেষ ছিল তা নয়। নারীর প্রতিও ছিল। নারীর জীবন তার কাছে একটি বিরক্তিকর জীবন ছিল। তাই সে বিয়ে করতে চায়নি। আর এই কারণেই তার মধ্যে স্ত্রীর জীবনের রোমাঞ্চ অথবা মাতৃত্বের অনুভূতি জাগেনি। বিশ্বমিত্র জানত না যে মিত্রবিন্দু যে কোন পুরুষের মত যে কোন নারীকেও ঘৃণা করে। তাই সে নারীর রূপ ধারণ করে মিত্রবিন্দুর মনে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সফল হতে পারেনি। তারপর সে বাচ্চাদের মায়ের মত স্নেহ করল, সব সময় মিত্রবিন্দুর কাছে তার স্বামীর গল্প করতে লাগল। এইভাবে আস্তে আস্তে সে মিত্রবিন্দুর মনে নিজের সন্তান ও স্বামীর প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা জাগাতে পারল। দিনের পর দিন চেষ্টা করে সে মিত্রবিন্দুর মন থেকে নারীর প্রতি ও পুরুষের প্রতি ঘৃণার বীজ উৎপাটিত করতে সফল হল।

রাজা বিক্রমাদিত্য এইভাবে মৌনভাব ভঙ্গ করার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ঐ গাছে চলে গেল। (কল্পিত)

প্রকৃত বন্ধু

এক ধনী ব্যবসায়ীর একটি মাত্র ছেলে ছিল। ছেলেটি খারাপ বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। ছেলে বন্ধুদের অবিশ্বাস করতে পারে না। ছেলেকে ফেরানোর চেষ্টা করল বাবা। বাবা ছেলেকে বলল, "বাবা, ব্যবসার ব্যাপারে আমাদের দুজনকে দূর দেশে যেতে হবে। আমাদের মণিমুক্তো বাক্সে পুরে কারো কাছে রেখে যেতে চাই।" ছেলে তৎক্ষণাৎ নিজের এক বন্ধুর নাম করল। ছেলের ইচ্ছা অনুযায়ী বাবা তার ঐ বন্ধুর কাছেই বাক্সটা রাখতে দিল।

দেশান্তর থেকে ফিরে ছেলে বন্ধুর কাছে বাক্স আনতে গেল। দুই বন্ধুতে কথা কাটাকাটি হল। ছেলে বাড়ি ফিরে বাপকে বলল, "বাবা, তুমি আমার বন্ধুকে অপমান করেছ। মণিমুক্তোর পরিবর্তে পাথর রেখেছিলে?"

বাবা হেসে বলল, "বাক্সে যে কী রেখেছি তা তোমার বন্ধুর খুলে দেখার কোন দরকার ছিল? এখন ভাবত পাথরের পরিবর্তে মণিমুক্তো রাখলে কি হত। আমার বন্ধুর কাছে একটা বাক্স রেখেছি। যাও নিয়ে এস।" ছেলে বাপের বন্ধুর কাছ থেকে মণিমুক্তোর বাক্স আনল। বাবা তাতেও পাথর পুরে রেখেছিল। বাবার বন্ধু কোন কথা বলল না। ছেলে তখন বাড়িতে এসে বাক্স খুলে দেখল পাথর আছে। বন্ধু-বাছাইয়ের পদ্ধতি ছেলে বাপের কাছে শিখে নিল।
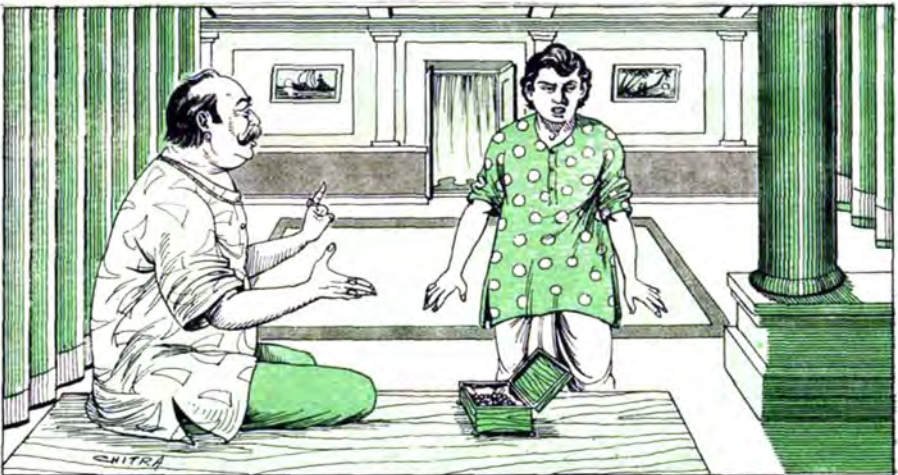
পরিশ্রমের বোঝা

গঙ্গাচরণের আপনজন বলতে সংসারে কেউ ছিল না। বাচ্চা বয়স থেকেই সে ধনীদের বাড়িতে কাজ করত। যাদের বাড়িতে কাজ করত তাদের বাড়িতে খেত এবং তাদেরই বারান্দায় রাত্রে ঘুমোত। গঙ্গাচরণের বিয়ে করার বয়স হল। সে পছন্দ করল তুলসীচরণের মেয়েকে। তাকে সে বিয়ে করতে চাইল।

গঙ্গাচরণ সোজা তুলসীচরণের বাড়িতে গিয়ে তাকে বলল, "আপনার আপত্তি না থাকলে আপনার মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাই।"

"ওহে, তুমি পরের বাড়িতে কাজ করে খাও। বিয়ে করে খাওয়াবে কি করে বউকে? আগে শ খানেক টাকা জমিয়ে আমার হাতে দাও তারপর বিয়ের কথা বল।" তুলসীচরণ পরিষ্কার ভাষায় বলল।

"একশো টাকা জমানো আর এমন কি কষ্ট। দূর দেশে গেলেই চাকরি পাব। এক বছরের মধ্যে একশো টাকা জমাতে পারব। তবে আপনাকে কিন্তু আপনার কথা রাখতে হবে।" গঙ্গাচরণ বলল।

"ঠিক আছে তোমাকে আমি এক বছর সময় দিলাম। এই এক বছরের মধ্যে তুমি একশো টাকা নিয়ে ফিরলে আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। কথা দিচ্ছি।" তুলসীচরণ বলল।

সেই দিনই রওনা হয়ে গঙ্গাচরণ দূর দেশে চলে গেল। একটা চাকরি জোগাড় করল। গঙ্গাচরণ এক ধনীর বাড়িতে গিয়ে বলল, "মশাই, আমি দূর দেশ থেকে এখানে চাকরি করতে এসেছি। আপনি দয়া করে আমাকে আপনার খিড়কির দরজায় একটু থাকার জায়গা দিন।" ধনী

সুশোভন মিত্র

লোকটা কি যেন ভেবে বাড়ির পিছনের একটা কুঁড়ে ঘরে থাকতে দিল।"

গঙ্গাচরণ এক দিনও বিশ্রাম না করে টাকা রোজগার করতে লাগল। যা বাঁচাতে পারত একটি পাত্রে রাখত। প্রত্যেকদিন ঘুমোনার আগে একবার পাত্রটা নেড়ে দেখে নিত। তারপর তুলসীচরণের মেয়েকে বিয়ে করার কথা ভেবে ঘুমিয়ে পড়ত।

এক বছরের আগেই একশোটা রুপোর টাকা জমে গেল ঐ পাত্রে।

তারপর গঙ্গাচরণ ধনীর কাছে গিয়ে বলল, "দয়া করে আমাকে নিজের গাঁয়ে ফেরার অনুমতি দিন। আমি এবার দেশে ফিরতে চাই।"

"তুমি কত টাকা রোজগার করেছ? দেখ, আমাদের এখানে যে আসে সেই অনেক টাকা রোজগার করে ফিরতে পারে।" ধনী লোকটা বলল।

গঙ্গাচরণ পোঁটলা থেকে ঐ পয়সা জমানোর পাত্র বের করে ধনীকে দেখাতে দেখাতে বলল, "বেশি জমাতে পারিনি। মাত্র একশো টাকা আছে এতে।"

একশো টাকার কথা শুনে ধনীর মনে লোভ হল। সে গঙ্গাচরণকে বলল, "গঙ্গাচরণ তুমি শেষে আমার সঙ্গেই ধোকাবাজী করছ? এই জন্যই কি আমি তোমাকে খিড়কির দরজায় থাকতে দিয়েছি?

শেষে তুমি আমারই টাকা জমানোর পাত্র চুরি করেছ? রাজার কাছে আমি নালিশ করতে যাচ্ছি। তুমি চল আমার সঙ্গে।"

ধনীর কথা শুনে রাজা বলল, "তুমি কি এই টাকা চুরি করেছ না পরিশ্রম করে রোজগার করেছ?"

"মহারাজ আমি অনেক দূর থেকে এই দেশে চুরি করতে আসিনি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে এসেছি। আমি প্রত্যেকদিন যা বাঁচাতে পারতাম তা এই পাত্রে জমাতাম।" গঙ্গাচরণ বলল।

"মিথ্যা কথা। আমি আমার স্ত্রীর জন্য গয়না গড়াতে ঠিক একশো টাকা জমিয়ে রেখেছিলাম এই পাত্রে। আমাদের কথা

এই লোকটা শুনেছিল। তারপর সুযোগ বুঝে টাকাসহ এই পাত্র চুরি করেছে।" ধনী বলল।

রাজা ঠিক বুঝতে না পেরে মন্ত্রীর দিকে তাকাল। মন্ত্রী ঐ পাত্রের দিকে দেখিয়ে গঙ্গাচরণকে বলল, "এই পাত্র আজ আমার কাছে থাক। কাল বিচার হবে।"

সেইদিন রাত্রে মন্ত্রী ঠিক ঐ ধরণের আরও কয়েকটা পাত্রে টাকা ফেলে দিল। কোনটাতে একশো টাকার চেয়ে কয়েক টাকা বেশি আবার কোনটাতে একশো টাকার চেয়ে কিছু কম। গঙ্গাচরণের পাত্রটিকেও ঐ পাত্রগুলোর মধ্যে রাখল।

পরের দিন দরবার বসল। মন্ত্রী সমস্ত পাত্রকে একত্রে পাশাপাশি রেখে বলল, "এই যে ধনী মশাই, আপনি কি আপনার পাত্র হাতে তুলে চিনতে পারেন?"

"কি করে চিনতে পারব। এ সব ত্রপাইতো একই রকম দেখতে। এর মধ্য থেকে নিজের যে কোনটা তা চিনে বের করতে পারব না।" ধনী বলল।

তারপর মন্ত্রী গঙ্গাচরণকেও একই প্রশ্ন করল। গঙ্গাচরণ তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে একটা একটা করে পাত্র হাতে তুলে ওজন অনুমান করতে করতে হঠাৎ একটা পাত্র হাতে নিয়ে বলল, "মহারাজ, এটাই আমার পাত্র। এতে ঠিক একশো টাকা আছে। বাকিগুলোতে কম অথবা বেশি আছে।"

মন্ত্রী পাত্রের টাকা গুনে দেখল। তাতে ঠিক একশো টাকা ছিল। এতে প্রমাণ হল পরিশ্রমের বোঝা যে কত তা যে পরিশ্রম করে একমাত্র সেই বুঝতে পারে। রাজা ধনী লোকটাকে দুশো টাকা জরিমানা করে সেই টাকা গঙ্গাচরণকে দিল।

গঙ্গাচরণ এই তিনশো টাকা নিয়ে সোজা নিজের গাঁয়ে ফিরে গিয়ে তুলসী-চরণকে দিল। তার মেয়েকে বিয়ে করে সে সুখে জীবন যাপন করতে লাগল।

ভাইয়ের অংশ

ধর্মপুরে ছিলেন এক ধর্মাত্মা রাজা। প্রত্যেক বছর তিনি অন্নবস্ত্র প্রজাদের মধ্যে বণ্টন করতেন। বণ্টন করার আগে তিনি প্রজাদের বুঝিয়ে বলতেন রাজ্য শাসনের সব কথা। ভাষণের শেষে বলতেন, "সমস্ত প্রজাই আমার ভাই। দেশের বা আমার সমস্ত সম্পত্তিই প্রজাদের। একবার একজন রাজপ্রাসাদে এসে প্রহরীকে বলল, "আমি রাজার ভাই। রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

রাজা ঐ লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন, "বল, কি বলতে চাও।"

"আমি আপনার প্রজা। আপনার ভাই। আমার অংশ নিতে চাই।"

রাজা অঙ্ক শাস্ত্রের পণ্ডিতদের ডেকে বললেন, "আমার রাজ্যের জনসংখ্যা কত, কত ধনসম্পত্তি আছে জেনে নাও। ভাল করে হিসেব করে সমস্ত সম্পত্তি দেশবাসীর মধ্যে সমান ভাগ করলে মাথা পিছু কত পড়ে জানাও।"

পণ্ডিতরা সব হিসের করে জানাল যে মাথা পিছু আধ পয়সা পাবে।

"খুব ভাল কথা। এই লোকটাকে পুরোপুরি এক পয়সা দিয়ে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দাও।" রাজা বললেন।

পুড়িয়ার দলিল

একবার গোলকোণ্ডার নবাব শিকার করতে গেল। এক হরিণকে ধরার চেষ্টা করতে করতে ঘন বনে ঢুকে গেল। সঙ্গে যারা ছিল তারা নবাবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পৌঁছাতে পারল না। ওরা পিছনে পড়ে রইল।

দুপুরের আগে নবাবের গলা শুকিয়ে গেল। নবাবের সঙ্গে যারা ছিল তারা তখনও তার কাছে পৌঁছাল না। ফলে তৃষ্ণায় তার বুক ফেটে যাওয়ার উপক্রম হল। আশে পাশে কোথাও এক ফোঁটা জল ছিল না। ক্লান্ত হয়ে নবাব বলল, "আল্লা, শেষে কি জলের অভাবে আমাকে মারা যেতে হবে!"

এদিকে ওদিকে ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে শেষে নবাব এক মন্দিরের কাছে পৌঁছাল। মন্দিরের পাশে একটি গাছ ছিল। গাছের অদূরেই ছিল এক পুকুর। দূর দূর থেকে লোকে এসে ঐ পুকুরের জল নিয়ে যেত। কারণ সেই জলের স্বাদ ডাবের জলের মত উপকারী ও সুস্বাদু।

নবাব তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে পেট ভরে ঐ পুকুরের জল পান করল। ক্লান্ত শরীরে ওখানকার গাছের নিচে শুলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই নবাব ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে! চারদিক থেকে যেন অন্ধকার ছুটে আসছে সেইখানে। নবাব তাড়াতাড়ি উঠে হাত পা ধুয়ে নামাজ পড়ল। এত তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে যাওয়াতে তার মনে হল যেন রাতটা তাকে সেখানেই কাটাতে হবে। তাই নবাব আগেভাগে মন্দিরের চত্বরে আশ্রয় নিল। কিন্তু খিদের জ্বালায় তার চোখে ঘুম আসছিল না।

নন্দিনী কাঞ্জিলাল

অনেকক্ষণ পরে দূরে একটি প্রদীপের আলো দেখতে পেল। আলো যেন ক্রমশ তার দিকেই এগিয়ে আসছে। দেখে তার মনে একটু ভয় ঢুকল। কিন্তু ভয় করলেও করার তো কিছু ছিল না। তাই নবাব মনে মনে আল্লাকে স্মরণ করে বসেছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্দিরের পূজারী প্রদীপ নিয়ে সেখানে এল। নবাবের অবস্থা জেনে পূজারী মন্দিরের ভিতরে গেল। ছাতুতে একটু গুড় মিশিয়ে পূজারী নবাবকে খেতে দিল।

নবাব ছাতু ও গুড় খেয়ে খিদে মিটিয়ে পূজারীকে পুরস্কার স্বরূপ একটু জমি লিখে দিল। তারপর যথাসময়ে নবাব ফিরে গেল নিজের পথে।

পূজারীর জমি পাওয়ার খবর পেল সেই জমির পাশের জমির মালিক। অনেক দিন ধরে সে ঐ জমি হাতানোর তালে ছিল। সে পূজারীকে নানাভাবে বাধ্য করল যাতে ঐ জমি পূজারী তার নামে লিখে দেয়। কিন্তু পূজারী কোনক্রমেই লিখে দিতে চাইল না।

"আমি যে জমির ফসল ঘরে তোলার কথা ভেবেছিলাম তুমি সেই জমি নবাবকে খুশী করে বাগিয়ে নিলে?" ধনী লোকটা পূজারীকে গাছের সঙ্গে বাঁধিয়ে চাকর দিয়ে মারধোরের ব্যবস্থা করল। সেই

প্রচণ্ড মার সহ্য করতে না পেরে পূজারী জমির ব্যাপারে নবাবের কাছ থেকে পাওয়া কাগজ ধনীকে দিয়ে দিল।

ধনী সেই কাগজটাকে টুকরো টুকরো করে ছিড়ে পূজারীকে ঐ কাগজের টুকরো চিবিয়ে গিলে ফেলতে বাধ্য করল। পূজারীকে তাই করতে হল।

কয়েকদিন পরে নবাবের মনে পড়ল ঐ পূজারীর কথা। নবাব খোঁজ করতে করতে ঐ মন্দিরের কাছে এল। সেখানে পূজারীকে পেল না। তখন কাছের এক কুঁড়ে ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করাতে কয়েকটি ছেলে বেরিয়ে এল। রোগা রোগা চেহারা। পরনে ছেঁড়া ও

জোড়াতালি দেওয়া জামা কাপড়। ওদের দেখে নবাবের মনে হল পূজারীকে যেটুকু জমি দান করা হয়েছিল তা তার পরিবারের লোকের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

ইতিমধ্যে নবাবের আসার খবর পেয়ে পূজারী তাড়াতাড়ি এসে কাঠের বোঝা মাথা থেকে নামিয়ে গুড় আর ছাতু গুলে নবাবকে খেতে দিল।

নবাব গুড়ছাতু খেয়ে বলল, "এক টুকরো কাগজ নিয়ে এসোতো। আমি তোমাকে উপহার দেব।"

"প্রভু, আমার একটা অনুরোধ আছে। কাগজে লিখে দেওয়া উপহার আমাকে দেবেন না। আমি তা গ্রহণ করতে পারব না।" পূজারী বলল।

"তাহলে কি তাম্রপত্রে লিখে দেব?" নবাব প্রশ্ন করল।

"না, না, তা করবেন না। ওরে বাবা তামা চিবিয়ে গেলা যাবে না। কিছুতেই পারব না। আপনি যা দেবেন ছোট্ট পুড়িয়ায় দিন। সেটা চট করে গিলে ফেলতে পারব।" পূজারী ভয় পেয়ে শান্ত স্বরে বলল।

"ওরে পাগল, দলিল কখনো পুড়িয়া করে দেওয়া যায়। ওসব কি গেলার বস্তু?" নবাব বলল।

"তাই গিলতে হয় প্রভু।" কাতরকণ্ঠে পূজারী বলল।

"কি বলছ পাগলের মত? আমি তোমাকে যে জমি দিয়েছিলাম তা কি তোমার হাতে এখন নেই?" নবাব বলল।

তারপর পূজারীর কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা শুনে নবাব ধনীকে ডেকে পাঠাল। তাকে চাবুক মারতে নির্দেশ দিল। চাবুক খেয়ে সত্য কথা স্বীকার করে ধনী পুজারীকে জমি ফেরত দিল।

পূজারী জমিতে চাষ আবাদ করে সুখে সপরিবারে বাকি জীবন কাটালো।

হনুমান হাজির

ছোট্ট একটি গ্রাম। সেই গ্রামের এক পরিবার পুতুল খেলা দেখিয়ে পেট চালাত। সেই পরিবারে ছিল স্বামী স্ত্রী, তাদের বুড়ো বাবা ও বুড়ি মা। চারটি ছেলেমেয়ে। দিন এনে দিন খাওয়া ওদের ভাগ্যে ছিল। নানান জায়গায় ওরা ঘুরে বেড়াত পুতুল খেলা দেখাতে।

অন্যবারের মত সেবারও গোটা পরিবারের লোকজন অন্য গ্রামের দিকে রওনা হল। কিন্তু সেই গ্রামে পৌঁছানোর আগেই রাত হয়ে গেল। তারা তখন একটি বট গাছের নিচে আশ্রয় নিল। ঠিক করল রাত্রের মত ঐ গাছতলায় কাটিয়ে সকালে গ্রামে যাবে।

মাঝ রাতে অনেকগুলো লোকের সাড়া শব্দ পেয়ে ওদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। কাছেই ওরা কয়েকটা ঘরবাড়ি দেখতে পেল। একের পর এক ঐ ঘরবাড়ি থেকে লোক আসতে লাগল তাদের কাছে। ওরা এসে পুতুল খেলা দেখাতে বলল।

"আরে মশাই পুতুল খেলা দেখানো অত সহজ নয়। তাঁবু খাটাতে হয়। পর্দা টাঙ্গাতে হয়। আলো জ্বালাতে হয়। এই মাঝ রাতে দেখাও বললেই কি আর দেখানো যায়। অতই সহজ? এখন কিছুতেই দেখানো যাবে না।" ঐ পরিবারের লোক বলল।

"তোমরা যা চাও তাই করা যাবে। আমরাই করে দেব। তোমরা এই রাত্রেই খেলা দেখাও।" পাড়ার লোক জোরে জোরে সমস্বরে বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই মিলে সব ব্যবস্থা করে দিল। পর্দা টাঙ্গানো হল। তাঁবু খাটানো হল। বুড়ি পর্দার সামনে

রত্নেশ্বর মজুমদার

একটি কাপড় বিছিয়ে দিল। যারা দেখে তারা ঐ কাপড়েই পয়সা ফেলে দেয়।

পুতুল নড়ল। গান শুরু হল। বাজনা বাজছে। লঙ্কাপুরী পর্দায় ভেসে উঠল। রাবণের দাপাদাপি শুরু হল। পুতুল খেলা একেবারে জমে উঠেছিল। দর্শকদের মধ্যেও হৈচৈ। আনন্দের উচ্ছ্বাস। নানা ধরণের মন্তব্য। কথা বলছে। মজা পাচ্ছে। সবাই সরব।

রাবণের দাপাদাপির পর হঠাৎ পর্দায় দেখা গেল হনুমানকে। হনুমানের আসার সঙ্গে সঙ্গে সবাই যেন অবাক। কোন সাড়া নেই। শব্দ নেই। প্রত্যেক দর্শক যেন দম বন্ধ করে তাকিয়ে আছে পর্দার দিকে। কিছুক্ষণের এই কঠিন নীরবতার পর বুড়ি কি ভেবে দর্শকদের দিকে তাকাল। দেখে একজনও নেই। তাঁবুতে কাক পক্ষীও নেই। তাঁবুও নেই। বুড়ি ঘাবড়ে গিয়ে নিজের বিছানা কাপড় তুলতে গিয়ে দেখে তাতে অনেক পয়সা পড়ে আছে।

ওরা দেখতে পেল না ঘরবাড়ি। ফাঁকা মাঠ। যত দূর দৃষ্টি যায় মাঠ আর গাছ-পালা। তখন ভেবে চিন্তে ওরা বুঝল যে যারা ওদের পুতুল খেলা দেখাতে বলেছিল আসলে ওরা জ্যান্ত মানুষ নয়। ওরা সব ভূত। ওরা ভূত ছিল বলেই হনুমানের পর্দায় আসার সঙ্গে সঙ্গে সব পালিয়ে গেল। তখন ওরা ঠিক করল ভূতগুলো যাতে কোন ক্ষতি না করে তার জন্য সারা রাত পর্দায় ঐ হনুমানের ছবি রাখবে।

যাইহোক, মাঝ রাতে পুতুল খেলা দেখিয়ে যে ওরা পয়সা পায়নি তা নয়। অনেক পয়সা পড়ে ছিল ঐ বিছানো কাপড়ে। আর হনুমানের ছবি সারা রাত থাকাতে ভূত ওদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। তাই ভূত হলেও পুতুল খেলার কারিগররা ঠকেনি।

চোখ খুলে গেল

এক দেশে ছিল এক ধনী। সে ছিল খুব কিপটে। তবে তার ছিল খুব খাবার লোভ। সে ভাল ভাল খাবার খেত। কিন্তু অন্যকে তার এঁটোও দিতে চাইত না। তার বউকে বা দুই সন্তানকে পেট ভরে খেতে দিত না। সারা দিন এটা ওটা নানা জিনিস খেত। বাচ্চারা তার খাবারের দিকে তাকালে সে তার বাচ্চাদের বলত, "এ সব ওষুধ।" এই ধনীর নাম শঙ্কর সাহা।

শঙ্কর সাহার প্রতিবেশী ছিল দিবাকর দাস। সে ছিল খুব গরিব। সে যা রোজগার করত বউ বাচ্চা সহ সবাই ভাগ করে খেত। বউ বাচ্চাদের না দিয়ে সে একা কখনো খেত না।

একদিন দিবাকরের ছেলে শঙ্কর সাহার বাড়িতে গেল। তখন শঙ্কর সাহা বাড়ির বারান্দায় বসে ফল খাচ্ছিল। শঙ্কর সাহার ছেলেমেয়ে তার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসেছিল। কিন্তু শঙ্কর সাহার সেদিকে নজর নেই। সে তাকাল দিবাকরের ছেলের দিকে। সে বিরক্ত হয়ে দিবাকরের ছেলেকে বলল, "কি হল, এখানে কি করতে এসেছ?"

"চন্দন আর লক্ষ্মীকে খেলতে ডাকতে এসেছি।" সবিনয়ে শঙ্কর সাহাকে দিবা-করের ছেলে বলল।

"যারে যা খেলগে যা।" বলল শঙ্কর সাহা নিজের ছেলেমেয়েকে।

চন্দন ও লক্ষ্মী দিবাকরের ছেলের সঙ্গে খেলতে গেল। পরে দিবাকরের ছেলে চন্দন ও লক্ষ্মীকে বলল, "কিরে, তোদের বাবা তোদের খেতে না দিয়ে একা একা ফল খাচ্ছিল কেন?"

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

"আমার বাবা তো আমাদের খেতে দেয় না। নিজে নিজেই খায়।" দুজনে সমস্বরে বলল।

একথা শুনে দিবাকরের ছেলে ঝট করে দাঁড়িয়ে বলল, "তোমরা এখানেই থাক। আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি।" বলে সে এক বৈদ্যের কাছে ছুটে গেল। বৈদ্যের নাম রঙ্গনাথ। রঙ্গনাথ তখন বাড়িতেই ছিল। দিবাকরের ছেলে তাকে নমস্কার করে বলল, "রঙ্গনাথবাবু, শঙ্কর সাহার কঠিন অসুখ হয়েছে। ভদ্রলোক খুব কিপটে তো তাই টাকা খরচ হয়ে যাবে ভেবে আপনাকে ডাকছেন না। আপনি তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁকে না দেখলে উনি আর বাঁচবেন কিনা সন্দেহ।"

এদিকে রঙ্গনাথ কারো অসুখের কথা শুনলে যতক্ষণ না তাকে সারান ততক্ষণ শান্তি পান না। তাই দিবাকরের ছেলের কথা শুনেই শঙ্কর সাহার বাড়ির দিকে ওষুধের থলি নিয়ে রওনা দিলেন।

রঙ্গনাথ গিয়ে দেখেন শঙ্কর সাহা ঘোরা-ঘুরি করছে। রঙ্গনাথকে দেখে আশ্চর্য হয়ে শঙ্কর সাহা বলল, "কি ব্যাপার, হঠাৎ আপনি ?"

রঙ্গনাথ হেসে বললেন, "এই আপনাকে দেখতেই এসেছি। শুনলাম আপনার শরীর ভাল নেই।"

"কেন আমার শরীর তো ঠিক আছে। আপনি দেখতেই পাচ্ছেন কেমন আছি।" শঙ্কর সাহা বলল।

"আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি আপনার কাছ থেকে কিচ্ছু নেব না। আপনার রোগ এমনি সারিয়ে দেব।" বললেন রঙ্গনাথ।

শঙ্কর সাহা বলল, "দেখুন আপনার চিকিৎসার টাকা কেউ দিতে পারবে না। আমি তো কোন ছার। তবে কথা হল আমার তো কোন অসুখ করেনি। তবু জানতে ইচ্ছে করছে আপনাকে কে বলল যে আমি অসুস্থ?"

রঙ্গনাথ বিরক্ত হয়ে বললেন, "আপনার প্রতিবেশী দিবাকরের ছেলে বলল।"

শঙ্কর সাহার ভীষণ রাগ হল। তৎক্ষণাৎ পাশের বাড়িতে গিয়ে দিবাকরের ছেলেকে ডেকে আনল। ওদের সঙ্গে তার নিজের ছেলেমেয়েও ছিল। রঙ্গনাথ দিবাকরের ছেলেকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কিরে, ইনি তো ভালই আছেন। তুই আমাকে ওসব কথা বলে এখানে আনলি কেন? এঁর তো কিছুই হয়নি।"

দিবাকরের ছেলে আস্তে আস্তে পরিষ্কার ভাষায় বলল, "ইনি নিজের ছেলেমেয়েদের খেতে না দিয়ে ফল খান। তাদের সামনে বসে থাকতেও তাদের হাতে একটা ফলও না দিয়ে খেয়ে থাকেন। আমার বাবা আমাকে না খাইয়ে খেতে চান না। তবে উনি যখন অসুখে পড়েন তখন অনেক সময় একাই খান। কারণ প্রচুর পরিমাণে ফল কেনার টাকা পয়সা আমাদের হাতে থাকে না"

"বাচ্চাদের না দিয়ে খাই বলেই কি তুমি আমাকে অসুস্থ ভেবেছ? আমার অসুখ করলে আমি বৈদ্য ডাকতে পারি না? তোমাকে ডাকতে কে বলেছে?" রাগে গজ গজ করতে করতে ধমক দিয়ে শঙ্কর সাহা বলল।

"আমি ভাবলাম, আপনি তো কিপটে তাই খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে বৈদ্য ডাকছেন না। ভাবলাম, রঙ্গনাথ মশাই যে অনেক সময় পয়সা না নিয়েই চিকিৎসা করে থাকেন তা আপনি জানেন না। তাই বৈদ্য ডেকে আনতে ছুটে গেছে আমার বন্ধু।" শঙ্কর সাহার ছেলেই বলল।

ছেলের মুখে এই ধরণের কথা শুনে শঙ্কর সাহা ভীষণ বিরক্ত হল। সে দিবা-করের ছেলেকে আবার প্রশ্ন করল, "হ্যাঁরে, আমি যে কিপটে সে কথা তোমাকে কে বলেছে? ছেলেদের খেতে দিইনি বলে কে বলেছে?"

"বাবা যে অসুখে পড়ে ফল খেতে খেতে বলেন, 'বাবা, তোকে না দিয়ে খেতে বড় কষ্ট হচ্ছে। হাড় কেপ্পন লোকও সন্তানকে না দিয়ে খেতে পারে না। কিন্তু কি করব বাবা, আমি যে গরিব।' তাই আমি ভাবলাম…"

"থাক বুঝেছি।" শঙ্কর সাহা বলল। কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে দিবাকরের ছেলের পিঠে হাত বুলালো। তারপর বলল, "রঙ্গনাথ মশাই, হয়ত এই ছেলেটার কথাই ঠিক। আমি সুস্থ নই। কারণ আমি আমার স্ত্রী বা সন্তানদের সুখী করতে পারছি না। ভালই হল আপনাকে আমাদের বাড়িতে এ ডেকে এনেছে।"

সেইদিন রাত্রে শঙ্কর সাহা দিবাকরের ও রঙ্গনাথের পরিবারের সবাইকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াল। সেই রাত থেকেই শঙ্কর সাহার ছেলে মেয়ে বউও অনেক ভাল ভাল খাবার খেতে পেল।

বুদ্ধির ঢেঁকি

এক গ্রামে এক বোকা লোককে লোকে 'বুদ্ধির ঢেঁকি' নামে ডাকত। লোকের কথা শুনে সে ঠিক করল বুদ্ধি জোগাড় করবে। সে এক জেলের পরামর্শ চাইল। জেলে বলল, "তুমি প্রত্যেক দিন একটা মাছের মাথা খাও। বুদ্ধি বাড়বে।"

বোকা লোকটা প্রত্যেকদিন জেলেকে একটি করে টাকা দিয়ে আস্ত একটি মাছের মাথা কিনে নিয়ে যেত। জেলে বাকি মাছটাকেও এক টাকায় বিক্রি করে ভাল লাভ করত। এক মাস কেটে গেলে লোকটা প্রশ্ন করল, "তুমি তো এতবড় মাছের জন্য নাও এক টাকা। এইটুকু মাথার জন্যও একটা টাকা নিচ্ছ?" জেলে হেসে বলল, "দেখলে তোমার বুদ্ধি খুলে গেছে।" বোকা লোকটা খুশী হয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

ঘটানন্দ স্বামী

কোন এক গ্রামে এক ধনী পরিবারের ছেলে ছিল সুবল। সে কাছের এক শহরে মামার বাড়িতে থাকত। তার মামার নাম ছিল ইন্দ্রলাল। ইন্দ্রলাল জাদু বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। সুবলের বয়স হল পনের।

মাঝে মাঝে ছুটিতে সুবল নিজের গ্রামে ফিরে আসত। আবার বিদ্যালয় খুলে গেলে সুবল শহরে চলে যেত। একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে গাঁয়ে ফিরে দেখে গাঁয়ের সবাই কি নিয়ে যেন হৈচৈ করছে।

"গাঁয়ে কি হয়েছে ? প্রত্যেকে কি বলাবলি করছে ?" সুবল সুশীল নামে তার এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল।

"তুমি জান না আমাদের গ্রামে এক মহাপুরুষ এসেছেন ? ঐ মহাপুরুষ সাক্ষাৎ দেবতা। আমরা যা চাইব তিনি তাই দেবেন। উনি জলের উপর হাঁটতে পারেন। আগুনের উপর ঘুরে বেড়াতে পারেন।" সুশীল বেশ মেজাজে এক নিশ্বাসে বলে ফেলল।

"তুমি নিজের চোখে এসব দেখেছ ?" সুবল জিজ্ঞেস করল।

"না আমি দেখিনি। তবে লোকে বলা-বলি করছে।" সুশীল বলল। কিছুক্ষণ কি যেন ভেবে পরে আবার সুশীল বলল, "তবে ওর একটা অদ্ভুত জিনিস আমি দেখেছি।"

"কি বলত ?" সুবল জিজ্ঞেস করল।

"উনি এমন একটা খড়ম পরে ঘুরে বেড়াতে পারেন যে খড়মে কোন পটি নেই। পটি ছাড়া খড়মে পা আটকায় কি করে ? আমি তো তাই ভাবি আর অবাক হই।" সুশীল বলল।

এ. সি. সরকার (জাদুকর)

সুবলের মনে সেই মুহূর্তে ঐ মহাপুরুষকে দেখার প্রবল ইচ্ছে জাগল। কিন্তু পথ চলার ক্লান্তির ফলে সে তক্ষুনি না গিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। সেদিন রাত্রে খেতে বসে সুবল মাকে জিজ্ঞেস করল, "মা শুনলাম আমাদের গাঁয়ে নাকি এক বিরাট লোক এসেছে? পটি ছাড়া খড়ম পরেন। ঐ খড়ম পরে হাঁটতে পারেন। শুধু তাই নয় উনি নাকি জলের উপর দিয়ে হেলায় হেঁটে যেতে পারেন। আগুনের উপর দিয়েও নাকি হেঁটে যেতে পারেন। তুমি দেখেছ তাকে?"

সুবলের মা হাত জোড় করে মাথায় ঠেকিয়ে বলল, "তুমি কি ঘটানন্দ স্বামীজীর কথা জিজ্ঞেস করছ বাবা? ঐ সব মহা-পুরুষ সম্পর্কে অত হাল্কা ভাবে কথা বলা উচিত নয়। উনি কোন সাধারণ মানুষ নয় বাবা! সাক্ষাৎ দেবতা।"

"উনি এমন কি কাজ করেছেন যে তোমরা তাকে মহাপুরুষ বলছ মা?" সুবল আবার প্রশ্ন করল।

"বাবা অন্যদের কথা জানি না। কিন্তু ঘটানন্দ স্বামীজীর ওষুধ যেন অমৃত। ঐ ওষুধ খেয়ে নকুলের ছেলের জ্বর মুহূর্তে সেরে গেল। শঙ্করের মেয়ে আমাশায় ভুগছিল স্বামীজী মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিয়ে যে ওষুধ দিয়েছিলন তা খেয়ে সেরে গেল।"

এসব কি সাধারণ লোকের ওষুধে হয় বাবা! সুবলের মা বলল।

"আমি যে শুনলাম উনি ফিতে ছাড়া খড়ম পড়ে দিব্যি হাঁটতে পারেন? তুমি হাঁটতে দেখেছ মা?" সুবল বলল।

"সে তো বাবা আমাদের গাঁয়ের সবাই দেখেছে। উনি তো আগুনের উপর দিয়ে হাঁটতে পারেন, জলের উপর দিয়ে হাঁটতে পারেন আরও কত কি। উনি যাকে আশীর্বাদ করেন সে নাকি অনেক বড় হয়। কোন অসুখে পড়ে না। জীবনে সাপ ছোবল মারে না। বাঘ তাকে দেখলে খাওয়া তো দূরের কথা ল্যাজ গুটিয়ে পালায়। তার কোন ফাঁড়া থাকে না। সারা জীবন

ভাল থাকে। তুমি বাবা কাল সকাল সকাল ঘটানন্দ স্বামীজীর কাছে গিয়ে প্রণাম করে এসো।" সুবলের মা ছেলেকে বলল।

সেই রাত্রিটা সুবল কোন রকমে কাটাল। পরের দিন সকালে সে সুশীল, বিষ্ণু, নটবর প্রভৃতি বন্ধুদের নিয়ে গাঁয়ের সেই প্রান্তে গেল যেখানে ঘটানন্দ স্বামী কয়েকজন শিষ্য নিয়ে ভালভাবে আসর জমিয়ে বসেছিল।

বটগাছের নিচে হরিণের চামড়ার উপরে ঘটানন্দ স্বামী বসেছিল চোখ বুজে হাতে রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে। সে যেন ধ্যানমগ্ন ছিল। শরীরের রঙ ছিল তার কালো। শরীরের গঠন মজবুত। লম্বা লম্বা চুল ও জটা মাথায়। তার দুই শিষ্যের গাল ভর্তি দাড়ি ছিল। ওরা অদূরে বসে স্বামীজীর জন্য গাঁজা সাজছিল।

কিছুক্ষণ পরে চোখ বুজেই স্বামীজী বলল, "হর হর ভম্ ভম্ শিব শম্ভু।" তারপর চোখ খুলে ছেলেদের দিকে তাকাল। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হেসে ওদের কাছে ডাকল। পরে ভয়ে ভয়ে কাছে এলে ওদের হাসতে হাসতে বলল, "ছেলেরা, তোরা আমাকে ভয় করছিস কেন? আয়, কাছে আয়। এই ফলগুলো তোরা নিয়ে যা।"

ওদের মধ্যে সুবল সাহসী হলেও সেই গম্ভীর পরিবেশে কিছুক্ষণের জন্য সে থমকে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর এক পা এক পা করে স্বামীজীর কাছে এল। তার পেছনে পেছনে অন্য ছেলেরাও এল। ওরা কাছে এলে স্বামীজী ওদের হাতে ফল দিয়ে বলল, "তোমরা সন্ধ্যের সময় আবার এসো। তোমাদের অনেক ফল ও মিষ্টি দেব।" ওরা সবাই ফেরার পথে নানা কথা বলাবলি করছিল, কথা কাটাকাটি করছিল ও ভাবছিল।

সুবল কিন্তু সাধারণত অত তাড়াতাড়ি কিছু বিশ্বাস করত না। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বামীজীর প্রতি তার যেন কোন রকম সন্দেহ পোষণ করতে ইচ্ছে করছিল না।

তার মনে প্রচণ্ড কৌতূহল জাগল স্বামীজীর অলৌকিক কাজ নিজের চোখে দেখার।

সেদিন সন্ধ্যায় অন্য ছেলেদের নিয়ে সুবল স্বামীজীর কাছে গিয়ে দেখে সেখানে বহু লোক জমে রয়েছে। কারও হাতে ফল, কারও হাতে মিষ্টি, আবার কারও হাতে দুধ ইত্যাদি। স্বামীজীকে দর্শন করতে কেউ খালি হাতে আসেনি।

আস্তে আস্তে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। স্বামীজীর পূজোর সময় হল। স্বামীজী হর হর শম্ভু বলে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। মুহূর্তে ওর দুজন শিষ্য দুপাশে হাজির হল।

"হাত পা ধুতে হবে। গঙ্গাজল কোথায়?" স্বামীজী জোরে জোরে তার অনুচরদের বলল।

"গঙ্গাজল আছে। আপনি হাত পা ধুতে পারেন।" একজন অনুচর বলল।

স্বামীজী এক পিঁড়ির উপর বসল। একজন অনুচর ঘড়া করে তার পায়ে জল ঢালতে লাগল। স্বামীজী হাত পা ধুল। অন্য অনুচর বিনা পটির খড়ম এনে তার সামনে রাখল। ঘটানন্দ ঐ খড়ম দুটির উপর দুটি পা রেখে কিছুক্ষণের জন্য চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর দু-চার পা গিয়ে আবার ফিরে এল নিজের জায়গায়। আর সঙ্গে সঙ্গে অদূরে দণ্ডায়মান জনতা সমস্বরে বলতে লাগল, "জয়, ঘটানন্দ স্বামীজীর জয়।"

এসব ব্যাপার দেখে সুবলের মাথা খারাপ হওয়ার উপক্রম হল। তার মনে

হল এরকম একটা ব্যাপার তো কেউ করতে পারে না। খড়ম পরার আগে জল দিয়ে স্বামীজীর পা ধোয়া হয়েছিল। কাজেই পায়ে অন্য কিছু লেগে থাকলেও ধোয়াতো হয়ে গেছে। সুবল মামার কাছে অনেক জাদু দেখেছে। কিন্তু প্রত্যেকটা জাদুই কিভাবে যে করা হয় তা বোঝার চেষ্টা করেছে। অনেক সময় বুঝতেও পেরেছে। কিন্তু তার মামা কোনদিনই এক জোড়া পটিহীন খড়মে পা রেখে হাঁটতে পারবে না।

সুবল সোজা চিঠি লিখল মামার কাছে। ঘটানন্দের সব কাজ কারবার মামাকে জানাল চিঠিতে। সুবলের মামা ঐ চিঠি ভালভাবে পড়ে ঐ চিঠির সঙ্গে আর একটা চিঠি লিখে তার এক বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দিল।

সেদিন ছিল রবিবার। জাদুকর ইন্দ্রলাল তিনজন বন্ধুকে নিয়ে বোনের বাড়িতে এল। মামাকে এভাবে হঠাৎ আসতে দেখে সুবল তো অবাক! মামার সঙ্গে যে তিনজন এসেছিল ওদের প্রত্যেকের গায়ে খুব শক্তি ছিল। গুণ্ডা গুণ্ডা চেহারা ওদের। চোখ মুখ দেখলে মনে হয় ওরা কোন একটা কাজ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

সুবল একটু ঘাবড়ে গেছে দেখে ইন্দ্রলাল বলল, "বুঝলে সুবল, তোমার চিঠি পড়ে আমার মনে ভীষণ কৌতূহল জাগল। তাই চলে এলাম।"

সুবল মনে মনে খুশী হল। যতই হোক তাদের গ্রামে স্বামীজীকে দেখার জন্য কতদূর থেকে মামা ও অন্যেরা এসেছে।

"তোমার স্বামীজী আর কোন খেলা দেখাতে পারে না?" ইন্দ্রলালের সাথে আসা তিনজনের একজন জিজ্ঞেস করল।

"উনি তো আরও অনেক খেলা দেখাতে পারেন।" অন্যজন বলল।

"আপনি কি করে জানলেন?" সুবল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"যা জানি আর যা শুনেছি তা যদি সত্য হয় তাহলে ঘটানন্দ স্বামী আরও অনেক

কিছু দেখাবেন। নিমু আর প্রসাদ তোমরা দুজনে স্বামীজীর উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। টের পেলেই ও কিন্তু কেটে পড়বে। আর ধরা যাবে না।" ওদের তিনজনের মধ্যে একজন বলল।

ওরা দুজন ভিখারীর পোষাক পরে সেখান থেকে সরে পড়ল। তৃতীয়জন সুবলকে বলল, "স্বামীজী সারা দিনে ঠিক কখন প্রার্থনায় বসে?"

"সময় হয়ে গেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই উনি খড়ম পরবেন। দেখতে চান তো তাড়াতাড়ি চলুন। আমি দেখাব।" সুবল বলল।

সবাই সেখানে গেল। সেই বটগাছের কাছে গিয়ে ইন্দ্রলালকে গোপনে একটি ছোট ফটো দেখিয়ে লোকটা বলল, "দেখ, এই ছবির সঙ্গে ঘটানন্দ স্বামীর অনেকখানি মিল আছে। বুঝলে ইন্দ্রলাল আমি যা ভেবেছি মনে হচ্ছে তাই হবে। আগে থেকে ভিখারী সেজে যারা চলে গিয়েছিল তারা স্বামীজীর খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াল। স্বামীজী যথারীতি হাত পা ধুয়ে খড়মে পা রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আবার হাঁটতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সুবল আনন্দে চিৎকার করে উঠল।"

"ভাল করে লক্ষ্য কর সুবল, খড়মের সঙ্গে পা এমনভাবে সেঁটে আছে যেন আঠা লেগে রয়েছে। নিশ্চয়ই কোন দামী আঠা হবে।" ইন্দ্রলাল বলল।

কিছুক্ষণ ভালভাবে দেখে সুবল কিছুটা যেন বুঝতে পারল।

ইন্দ্রলাল বলল, "বুঝলে সুবল, এই ঘটানন্দ স্বামী আসলে একজন পুরানো দাগী আসামী। আর আমার এই বন্ধুটি হচ্ছে পুলিশ ইন্সপেক্টর। এবার ভাল করে লক্ষ্য রেখো তোমার চোখের সামনে এখন অনেক কিছু ঘটবে।"

হঠাৎ বাঁশী বেজে উঠল। জনতার মধ্য থেকে ঐ দুজন ভিখারী ছুটে এসে হাতকড়া নিয়ে ঘটানন্দের পাশে দাঁড়াল। ওরা দুজনে যে কোন পরিস্থিতির জন্য দাঁড়িয়ে

রইল। ওদের অফিসার 'হাত তোল' বলে চিৎকার করে উঠল। জনতা অবাক হয়ে দেখল অফিসার রিভলভার উঁচিয়ে ঘটানন্দকে কি যেন বলছে।

"রামলাল, এবার তোমার খেলা শেষ কর।" একথা বলে অফিসার ঘটানন্দরূপী রামলালের দাড়ি ধরে জোরে টান মারল। সঙ্গে সঙ্গে ঘটানন্দের মুখ থেকে দাড়ি খসে পড়ল। রামলালের আসল রূপ সবাই দেখতে পেল।

তারপর পুলিশ ইন্সপেক্টার সেখানে সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলল, "বন্ধুগণ, আপনারা চোখের সামনে দেখতে পেলেন, নকল দাড়ি পরে কিভাবে এই লোকটা আপনাদের ঠকাচ্ছে। এই দাগী লোকটার আসল কাহিনী এবার আপনারা শুনুন। এর আসল নাম রামলাল। লোকটা ডাকাত দলের নেতা। একে একবার জেলে পোরা হয়েছিল। কিন্তু…"

ইন্সপেক্টার দেখতে পেল রামলাল থলিতে হাত ঢোকাতে যাচ্ছে। তাই সে চিৎকার করে বলল, "রামলাল, তোমার থলিতে যে রিভলভারটা আছে তা যদি বের করার চেষ্টা কর তাহলে তোমার মাথা গুলি করে উড়িয়ে দেব। লক্ষ্মী ছেলের মত দুটো হাত বাড়িয়ে দাও। হাতকড়া পরানো হবে।" তারপর অত লোকের সামনে রামলালের দু হাতে হাত-কড়া পরানো হল।

ঘটানন্দের থলি থেকে একে একে রিভলভার, কার্তুজ, জ্বর ও পেট খারাপের ওষুধ বের করা হল।

জনতা তো যত দেখে তত অবাক হয়।

"ওহে স্বামীজী, এসব ওষুধ পত্তর জলে মিশিয়ে মন্ত্র পড়ার ঢং করে আমাদের ঠকাতে? আহা আর কিছুক্ষণ থাকলে ছুটে গিয়ে মাকে নিয়ে এসে তোমার রূপ দেখাতাম।" সুবল মনে মনে বলল।

নিন্দা প্রশংসা

একবার এক রাজার কাছে পাশের রাজ্য থেকে তিন বোন এল। তিন জনই যথাক্রমে গীতে নৃত্যে ও সঙ্গীতে নিজের নিজের প্রতিভার পরিচয় দিল। রাজা তাদের প্রশংসা করলেন কিন্তু কোন উপহার দিলেন না অতিথিশালায় থাকতে বললেন। অতিথিশালায় অন্য যারা ছিল তারা প্রত্যেকে গুপ্তচর।

অতিথিশালায় ঢুকেই তিন বোন রাজাকে তিন ধরণের কথা বলে নিন্দা করল। বড় বোন বলল, "এই রাজা জ্বলন্ত কাঠ।" মেজ বোন বলল, "না। কাঁটার পোঁটলা।" ছোট বলল, "মোটেই না। উনি আস্ত একটা পাথর।"

রাজা পরের দিন ওদের বললেন, "কাল তোমরা কে কি বলেছ? বল।" "মহারাজ, আমি আপনাকে জ্বলন্ত কাঠ বলেছি। কারণ, কাঠ জ্বললে রান্না হয়। পরে খাবার পালা।" বড় বোন বলল। "মহারাজ, আপনাকে আমার মনে হয়েছে আস্ত একটি কাঁঠাল। আমার বক্তব্যের অর্থ হল আস্তে আস্তে কোয়াগুলো বের করে খেলেই মজা।" পরে ছোট বোন বলল, "মহারাজ, ওদের কথায় আমি সায় দিতে পারিনি। আপনি জানেন কাঁঠাল বেশিদিন ভাল থাকতে পারে না। নষ্ট হয়ে যায়। তাল মিছরি অনেক দিন থাকে। বাইরের রূপ তার পাথরের মত হলেও মুখে ফেললেই তা গলতে থাকে। তাল মিছরির কথা মনে রেখেই আপনাকে আমি আস্ত পাথর বলেছি।"

রাজা ঐ তিন বোনের কথা বলার অপূর্ব কৌশল লক্ষ্য করে তিনজনকেই উপহার দিয়ে বিদেয় দিলেন।

ধারানগরের পণ্ডিত

ধারানগরের রাজা ভোজ মহাকবিদের উপহার দেন বলে যথেষ্ট প্রচার ছিল। রাজা ভোজ সব সময় কবিদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করে সময় কাটাতে ভালবাসতেন। কবিদের ভরণ-পোষণের ভারও রাজা ভোজ বহন করতেন। এই কবিদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন মহাকবি কালিদাস। এসব কথা শুনে কান্তি কবির খুব ঈর্ষা হল।

কান্তি কবি কালিদাসের স্থান অধিকারের উদ্দেশ্যে ধারানগরে এল। এক মেয়েকে সে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কার মেয়ে ?"

মেয়েটি জবাবে বলল ঃ

"হর হর স্মরতে নিত্যম্,
বহু জীব প্রপালকঃ
অরণ্যে বসতে নিত্যম্,
তস্যাহম্ কুল বালিকা।"

(এর অর্থ ঃ সব সময় অরণ্যে থাকে, হর হর নাম জপে, অসংখ্য প্রাণীর পালনকারী বংশের কৃষক-কন্যা আমি।)

কান্ত কবি এই জবাব শুনে অবাক হল। কয়েকজন মহিলা জল তুলছে দেখে এক-জনকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে ?"

মেয়েটি বলল ঃ

"চতুর্মুখো ন চ ব্রহ্মা,
বৃষারূঢ়ো ন শঙ্করঃ,
অকালে বর্ষতে মেঘঃ,
তস্যাহম্ কুল বালিকা।"

(অর্থাৎ চারটি মুখ হলেই ব্রহ্মা হন না, বলদের উপর চড়লেই শিব হন না। অকালে যে মেঘ বৃষ্টি দেয় আমি সেই বংশের মেয়ে। মানে জল বহনকারী পরিবারের মেয়ে।)

জবাব শুনে কান্তি কবি আরও অবাক হয়ে গেল। কৌতুহলও বাড়ল। আরও

রত্নাকর ভট্টাচার্য

এক মেয়েকে প্রশ্ন করল, "তুমি কে?" জবাবে মেয়েটি বলল ঃ

"পঞ্চভর্তা ন পাঞ্চলী,
দ্বিজিহ্বা ন চ সর্পিণী,
বানরী ন চ কৃষ্ণাস্যা,
তস্যাহম্ কুল বালিকা।"

(অর্থাৎ সে লেখকের কন্যা। কলমের ভার বহনের জন্য পাঁচটি আঙ্গুল ব্যস্ত থাকলেও কলম দ্রৌপদী নয়। দুটো জিব থাকলেও তা সাপ নয়। কলমের মুখ কাল হলেও তা বানর নয়।)

কান্তি কবি আরও খুশী হয়ে এক মেয়েকে প্রশ্ন করল, "কে তুমি?" মেয়েটি বলল ঃ

"নিত্যম্ জুহোতি দ্রব্যাণি
চৌর্যকারী দিনে দিনে,
শত্রুম্ মিত্রম্ ন জানাতি,
তস্যাহম্ কুল বালিকা।"

(অর্থাৎ সব সময় হোমাগ্নিতে যে পদার্থ পোড়ায়, শত্রুমিত্র জ্ঞান না রেখে প্রত্যেক দিন সোনা চুরি করা জাতির কন্যা আমি।)

কান্তি কবির বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। হঠাৎ এক মেয়েকে জিজ্ঞেস করল, "কে তুমি?" সে বলল ঃ

বাহুরস্তি শিরো নাস্তি,
ন সন্ত্যম গুলিকা দশ,
তস্যোৎত্বত্তি করোয়স্তু,
তস্যাহম্ কুল বালিকা।"

(হাত থাকতেও, মাথা নেই আর আঙ্গুল নেই। অর্থাৎ জামা যারা বানায় আমি তাদের কন্যা। দর্জির মেয়ে।)

তখন কান্ত কবি হাঁটতে হাঁটতে ভাবল, "এই ধারা নগরীর মেয়েরাই যখন এতটা বিদ্বান, পুরুষরা না জানি কত বড় পণ্ডিত! অন্য পুরুষরাই যদি পণ্ডিত হয়, মহাকবি কালিদাস নিশ্চয় আরও অনেক বড় পণ্ডিত হবেন। আর এক মহিলার সঙ্গে দেখা। সে বলল, কে তুমি?" মেয়েটি বলল ঃ

"নির্জীবো জীবিতো বাপি
শ্বাসোচ্ছাস বিশেষতঃ,
কুটুম্ব কলহো নাস্তি,
তস্যাহম্ কুল বালিকা।"

(প্রাণ না থাকলেও প্রাণ থাকার মতই প্রশ্বাস ছাড়ে। যে লোহারদের পরিবারে ঝগড়া হয় না সেই ধরণের পরিবারের মেয়ে আমি। আমি হাপর চালাই।)

এমন সুন্দর ব্যাখ্যা শুনে কান্তি কবি অবাক হল। আরও দু-পা এগোতেই অন্য এক মহিলার দেখা পেল। তাকে প্রশ্ন করল, তোমার পরিচয় জানাবে ?"

সে জবাবে বলল ঃ

"দ্বিরাজা, নগরী একা,
নিত্যম্ যুদ্ধম্ চ জায়তে,
তদুৎপত্তি করোয়স্ত,
তস্যাহম্ কুল বালিকা।"

(অর্থাৎ একই নগরের দুই রাজা। ওরা সব সময় ঝগড়া করে। এই কলহ সৃষ্টি-কারীর কন্যা আমি। এই কথার সহজ অর্থ হল, তুলো ধুনে যারা তুলো থেকে বীচি বের করে, তুলো ধোনাই করে যারা আমি সেই জাতির পরিবারের কন্যা।)

ততক্ষণে আর এক মহিলা সেখানে পৌঁছে গেল। কান্তি কবি তাকে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, তুমি কে বলত ?"

সে বলল ঃ

চক্রৈকম্ ন রথীসূর্যো,
ভূমৌ তিষ্ঠতি সারথিঃ,
অগস্ত্যতাৎ নির্মাণ
তস্যাহম্ কুল বালিকা।"

(অর্থাৎ চাকা একটাই। সারথি বসে পৃথিবীতে। অগস্ত্যের পিতাকে সৃষ্টি করে। আমি এমন এক পরিবারের কন্যা। মেয়েটি বলতে চায় যে আমি মাটির হাঁড়ি যারা তৈরি করে সেই কুমোর পরিবারের মেয়ে।)

ধারা নগরের মেয়েদের মুখে অপূর্ব সুন্দর শ্লোক শুনে মহাকবি কালিদাসকে পরাজিত করার ইচ্ছা কান্তি কবির মন থেকে উবে গেল। সে আর না এগিয়ে সোজা বাড়ি ফিরে গেল।

মহাভারত

ক্রমাগত দশ দিন ধরে পাণ্ডবদলকে নিপীড়িত করায় ধর্মাত্মা ভীষ্মের মনে বিরক্তি ও দুর্বলতা এসেছিল। তিনি আর নরশ্রেষ্ঠগণকে বধ করবেন না স্থির করলেন।

দশম দিনের যুদ্ধে একাকী ভীষ্ম বহু অশ্ব ও হস্তী, সাত মহারথ, পাঁচ হাজার রথী, চোদ্দ হাজার পদাতিক এবং বহু গজারোহী ও অশ্বারোহী বিনষ্ট করলেন।

এদিকে তখন অর্জুন এগিয়ে এলেন শিখণ্ডীকে সামনে রেখে। শিখণ্ডীকে সামনে রেখেই অর্জুন ভীষ্মের উপর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

শিখণ্ডী নয়টি তীক্ষ্ণ বাণ ভীষ্মের বুকে নিক্ষেপ করলেন। এতে ভীষ্ম কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। দিনের শেষে সূর্য অস্ত যাওয়ার কিছুক্ষণ আগে অর্জুনের শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়লেন। তার পর তিনি পূর্ব দিকে মাথা রেখে রথ থেকে পড়ে গেলেন। স্বর্গের দেবতারা ও মর্তের রাজগণ হাহাকার করে উঠলেন। ইন্দ্রধ্বজের মতই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত হলেন ভূতলে। কিন্তু তাঁর সমস্ত দেহ শরে আচ্ছাদিত থাকায় তিনি মাটি স্পর্শ না করে সেই শরের উপরেই শায়িত রইলেন।

কৌরবগণ বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। কি করবেন কিছুই ভেবে পেলেন না। দুর্যোধন ও কৃপ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। আর যুদ্ধ করার ইচ্ছে তাঁদের রইল না।

পাণ্ডবদের জয়

তিনি রাজাদের দিকে বেদনার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে জল চাইলেন।

তৎক্ষণাৎ সকলে নানাপ্রকার সুস্বাদু খাবার ও শীতল পানীয় নিয়ে এলেন তাঁর তৃষ্ণা নিবারণ করার জন্য। কিন্তু ভীষ্ম বললেন, "দেখ বৎসগণ, আমি মানুষের ভোগের জিনিস গ্রহণ করতে পারি না।"

তারপর ভীষ্ম অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার শরের আঘাতে আমার এই দেহ আবৃত হয়ে আছে। যন্ত্রণায় আমার কণ্ঠ শুকিয়ে যাচ্ছে। তুমিই শাস্ত্র-সম্মত বিধি অনুযায়ী জল দাও।"

তখন অর্জুন ভীষ্মকে প্রদক্ষিণ করে

এদিকে পাণ্ডবগণ বিজয়ের আনন্দে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করতে লাগলেন। আর ভীষ্ম ধ্যানস্থ হয়ে মহোপণিষৎ জপে নিমগ্ন হয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগলেন।

পরদিন সকালে আবার সকলে ভীষ্মের কাছে হাজির হলেন। হাজার হাজার কন্যা ভীষ্মের শরীরে চন্দন ও মালা অর্পন করতে লাগলেন। বহু স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধ, তূর্য-বাদক নট নর্তকী আরও অনেক শিল্পীরাও তাঁর কাছে উপস্থিত হল। কৌরব আর পাণ্ডবরা সকলেই বর্ম ত্যাগ করে আগের মতই স্নেহ ভালবাসার বাঁধনে ভীষ্মের কাছে উপস্থিত হলেন। অসীম ধৈর্য সহকারে ভীষ্ম সমস্ত যন্ত্রণা ও কষ্ট সহ্য করলেন।

রথে আরোহণ করলেন। মন্ত্রপাঠ করে গাণ্ডীবে পর্জন্যাস্ত্রযুক্ত বাণ খোঁজ করে সেই বাণ দিয়ে ভীষ্মের দক্ষিণ দিকের মাটি বিদ্ধ করলেন। তৎক্ষণাৎ ঐ স্থান থেকে অমৃত সমান দিব্যগন্ধযুক্ত সুস্বাদু শীতল জলের ধারা উঠতে লাগল। সেই জলে অর্জুন ভীষ্মের তৃষ্ণা মেটালেন। সব রাজারা অবাক হয়ে উত্তরীয় নাড়তে লাগলেন। চারদিক থেকে শঙ্খধ্বনি ও দুন্দুভির রবে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল।

দ্রোণের ইচ্ছের কথা এক বিশ্বস্ত অনু-চরের কাছে শুনতে পেলেন যুধিষ্ঠির। তিনি অর্জুনকে বললেন, "দ্রোণের ইচ্ছের কথা তুমি শুনলে তো? এখন যাতে তা

ব্যর্থ হয় সেই চেষ্টা কর। কিন্তু দ্রোণের প্রতিজ্ঞায় ফাঁক আছে। তাই তুমি আজ আমার কাছে থেকেই যুদ্ধ কর। কোনক্রমেই যেন দুর্যোধনের উদ্দেশ্য সাধন না হয়।

অর্জুন বললেন, "মহারাজ, দ্রোণকে বধ করা আমার কর্তব্য নয়। আবার আপনাকে ত্যাগ করে যাওয়াও আমার কর্তব্য নয়। প্রাণ থাকতে আমি তাঁকে বধ করতে পারব না। আর আপনাকেও ছেড়ে যাব না। যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ দ্রোণ আপনাকে নিগৃহীত করতে পারবেন না।"

সমস্ত যোদ্ধা এবং যুধিষ্ঠির প্রমুখ চারদিক থেকে দ্রোণকে আক্রমণ করলেন। সহদেব ও শকুনি, নকুল ও তাঁর মামা শল্য, দ্রোণাচার্য ও দ্রুপদ, ভীমসেন ও বিবিংশতি, ধৃষ্টকেতু ও কৃপ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সুশর্মা, শিখণ্ডী ও ভূরিশ্রবা, অভিমন্যু ও বৃহদ্‌বল, বিরাট ও কর্ণ, ঘটোৎকচ ও অলম্বুষ, সাত্যকি ও কৃতবর্মা এঁদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ চলতে লাগল। সে কি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। সকলেই এক একজন বিরাট যোদ্ধা। এইভাবে অভিমন্যু বৃহদ্‌বলকে রথ থেকে ভূতলে ফেলে দিলেন। তারপর অভিমন্যু চর্ম ও খড়্গ নিয়ে তাঁর পিতার চরম শত্রু জয়দ্রথের নিকট দ্রুত এগিয়ে এসে তাঁকে আক্রমণ করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই অভিমন্যু জয়দ্রথকে পরাজিত করলেন।

এদিকে শল্য আবার অভিমন্যুকে আক্রমণ করলেন। অভিমন্যু শল্যের সারথিকে নিহত করলেন। তখন শল্য রথ থেকে গদাহস্তে নাবলেন। তাঁকে গদা হাতে নাবতে দেখে অভিমন্যুও প্রকাণ্ড গদা হাতে নিয়ে তাঁকে সানন্দে আহ্বান করলেন। ভীম প্রবল বিক্রমে শল্যের সঙ্গে গদাযুদ্ধ আরম্ভ করলেন। প্রচণ্ড দুই গদার সংঘাতে আগুনের শিখা বেরুতে লাগল। এইভাবে বহুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর শল্য ও ভীম দুজনেই আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁকে এই অবস্থায় দেখে কৃতবর্মা এগিয়ে এসে নিজের রথে শল্যকে তুলে নিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন।

তাঁরা চলে যেতেই মুহূর্তমধ্যে ভীমসেনও মাটি থেকে উঠে পড়লেন।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বলতে লাগলেন, "একটি গোপন কথা বলছি শোন। আমি চার মূর্তি ধারণ করে লোকের কল্যাণ সাধন করি। আমার এক মূর্তি জগতের সাধু ও অসৎ বা কুকর্ম দেখে, আর এক মূর্তি তপস্যা করে, আর তৃতীয় মূর্তি মনুষ্য-লোকে কাজ করে থাকে আর চতুর্থ মূর্তি হাজার বছর ঘুমিয়ে থাকে। হাজার বছর পূর্ণ হলে আমার সেই চতুর্থ মূর্তি জেগে ওঠে। তখন যোগ্য ব্যক্তিদের বর দান করে। ঠিক সেই সময়ে পৃথিবীর প্রার্থনায় তাঁর পুত্রকে আমি বর দিয়েছিলাম। তাঁর পুত্র নরককে আমি তখনই বৈষ্ণবাস্ত্র দান করেছিলাম। এই অস্ত্র পেয়েছিলেন প্রাগ জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত নরকাসুরের কাছ থেকে। এই জগতে ঐ অস্ত্রের অবধ্য কেউ নেই। তাই আজ তোমাকে রক্ষার জন্যই আমি বৈষ্ণবাস্ত্র গ্রহণ করেছি এবং তা মালারূপে গলায় ধারণ করেছি।"

দ্রোণ শেষ পর্যন্ত কর্ণকে উপদেশ দিলেন, পেছন দিক থেকে যেন অভিমন্যুকে আক্রমণ করে। কর্ণ তাঁর উপদেশ মতই পিছন দিক থেকে অভিমন্যুকে আক্রমণ করলেন এবং তাঁর ধনু ছিন্ন করলেন। তাছাড়া অভিমন্যুর ঘোড়া ও সারথিকে বধ করলেন। এই সুযোগে কৃপ, কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, দুর্যোধন ও শকুনি নিষ্ঠুরভাবে অভিমন্যুর উপর শর নিক্ষেপ করলেন।

অভিমন্যু লাফিয়ে নেমে পড়লেন রথ থেকে খড়্গ আর চর্ম নিয়ে। বালক অভিমন্যু একাই লড়তে লাগলেন ঐ ছজন মহারথদের সঙ্গে।

দুঃশাসনের ছেলে এই সময়ে গদার আঘাত করলেন অভিমন্যুর মাথায়। অভিমন্যু চেতনা হারিয়ে পড়ে গেলেন।

অর্জুনকে কৃষ্ণ বললেন, "আমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ কাল জয়দ্রথকে সূর্যাস্তের পূর্বেই বধ করবে। দেখো, তোমার এই সাহসের

জন্য আমরা যাতে হাসির পাত্র না হই। কৌরব শিবিরে আমি চর পাঠিয়েছিলাম। তাদের নিকট জানতে পেরেছি, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, বৃষসেন, কৃপ ও শল্য এই ছয় মহারথ জয়দ্রথের সঙ্গে থাকবেন। তাঁরাই তাঁকে রক্ষা করার প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। আগে তাঁদের সকলকে জয় করতে হবে। তাঁদের জয় করলেই তুমি জয়দ্রথকে পাবে।"

কৃষ্ণের কথা শুনে অর্জুন বললেন, "হে কেশব, আমি এঁদের সকলের মিলিত শক্তিকে আমার অর্দ্ধেকের মতই মনে করি।"

ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন করে অর্জুন তাঁর মন্ত্রসিদ্ধ বজ্রসম বাণ ছুঁড়লেন। বাজ পাখীর মত সেই বাণ দ্রুতবেগে ধাবিত হল জয়দ্রথের দিকে। নিমেষের মধ্যে তাঁর মাথা ছিন্ন করে আকাশের দিকে উপরে উঠতে লাগল। তখন অর্জুন আরও কতকগুলি বাণ নিক্ষেপ করলেন। সমস্ত বাণগুলি জয়দ্রথের সেই ছিন্ন মুণ্ড বহন করে আরও উপরের দিকে উঠতে লাগল। তারপর অর্জুন ছয় মহারথের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের বৈবাহিক রাজা বৃদ্ধক্ষত্র সেই সময়ে বসে সন্ধ্যাপূজা করছিলেন। সহসা জয়দ্রথের মাথা তাঁর কোলের উপরে এসে পড়ল।

দ্রোণের শরবৃষ্টিতে পাণ্ডব সেনারা অনবরত মারা যাচ্ছে দেখে কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, "দ্রোণের হাতে যতক্ষণ তীর-ধনুক আছে, ততক্ষণ তাঁকে দেবতারাও পরাজিত করতে পারবেন না। তাঁর হাত থেকে তীর-ধনুক পড়ে গেলে তাঁকে বধ করা সহজ হবে। এখন তোমাদের উচিত ধর্মের ব্যাপারে অত চুলচেরা হিসেব না করে যে কোন ভাবে জয়ী হওয়া। অশ্বত্থামা মারা গেছে বলে কেউ যদি তাঁকে জানাতে পারে, তাহলে উনি দুঃখে ভেঙ্গে পড়বেন। অস্ত্র ফেলে দেবেন।"

কৃষ্ণের এই পরামর্শ অর্জুনের ভাল লাগল না। কিন্তু অন্যেরা তাঁর এই পরামর্শ
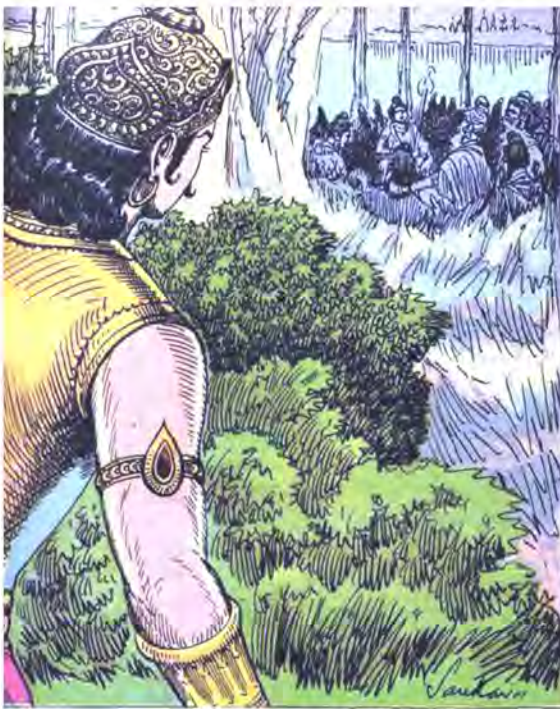
মেনে চলতে চাইল। এমন কি যুধিষ্ঠিরও অনিচ্ছা প্রকাশ করেও শেষে কৃষ্ণের মতে চলতে চাইলেন। গালবরাজ ইন্দ্রবর্মার অশ্বত্থামা নামে একটি হাতী ছিল। ভীম তাকে গদা দিয়ে বধ করলেন। তাড়াতাড়ি দ্রোণের কাছে গিয়ে ভীম বললেন, "অশ্বত্থামা হত হয়েছে।"

ভীমসেনের ঐ কথা শুনতে পেয়ে দ্রোণের সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ল। কিন্তু দ্রোণ তাঁর পুত্র অশ্বত্থামার বীরত্বে নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাই তিনি আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের উপর তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। এতে ধৃষ্টদ্যুম্নের সমস্ত অস্ত্র ও রথ বিনষ্ট হল। তখন ভীম তাড়াতাড়ি সেখানে এসে তাঁকে নিজের রথের উপর তুলে নিলেন।

যুদ্ধে বিরত হয়ে ম্লান মুখে দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলেন।

তাঁর এই কথায় কৃষ্ণ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "দ্রোণ যদি আর এক বেলা যুদ্ধ করেন, তবে আপনার সমস্ত সৈন্য ধ্বংস হবে। সকলকে রক্ষার জন্য এই মুহূর্তে মিথ্যে কথাই বলুন। জীবন রক্ষার্থে মিথ্যে বললে পাপ হবে না।"

ভীম যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "মহারাজ, আপনি কেশবের কথামত কাজ করুন। আচার্যকে বলুন যে অশ্বত্থামা মারা গেছেন। আপনার কথাই দ্রোণ বিশ্বাস করবেন।"

নিরুপায় যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের প্রেরণায় ও ভীমের সমর্থনে শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন। মিথ্যে বলার বিষয়ে তাঁর যেমন ভয় ছিল তেমনি জয়লাভের আকাঙ্খাও ছিল। তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন, "অশ্বত্থামা হতঃ", অশ্বত্থামা হত হয়েছেন। পরে অস্পষ্টস্বরে বললেন, "ইতি কুঞ্জরঃ", এই নামের হস্তী।

দ্রোণাচার্য রক্তাক্ত শরীরে নিরস্ত্র হয়ে রথের উপর বসে আছেন দেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুত তাঁর দিকে ছুটে গেলেন।

তাই দেখে অর্জুন পিছন থেকে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, "আচার্যকে জীবিতই নিয়ে এস, বধ করো না।" কিন্তু অর্জুনের

বারণ সত্ত্বেও ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের প্রাণশূণ্য দেহের চুল ধরে মস্তক ছিন্ন করলেন এবং ঘুরিয়ে সিংহের ন্যায় গর্জন করতে লাগলেন।

দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর পর কৌরব সৈন্য-দল ভেঙ্গে গেল। কৌরবদলের রাজারা দ্রোণের শরীরের সন্ধান করলেন। কিন্তু তাঁর দেহ দেখতে পেলেন না।

হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্র নিজের শত পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ভেঙ্গে পড়লেন। সঞ্জয় তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন।

ধৃতরাষ্ট্রকে অনুসরণ করে গান্ধারী কুন্তী প্রমুখরা যুদ্ধ ভূমিতে এলেন। এই খবর পেয়ে পাণ্ডবেরা কৃষ্ণ সাত্যকি প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে এলেন।

যুধিষ্ঠির সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছিল। তিনি যুধিষ্ঠিরকে প্রথমে আলিঙ্গন করলেন। তারপর ভীমকে আলিঙ্গন করতে এগোতেই কৃষ্ণ হঠাৎ ভীমকে পিছন দিকে টেনে ভীমের একটি লোহার মূর্তিকে ধৃতরাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত শক্তি দিয়ে আলিঙ্গন করলেন। ঐ মূর্তি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। মূর্তির পরিবর্তে-ভীম হলে, তিনি নিশ্চয়ই মারা যেতেন। ধৃতরাষ্ট্রের শরীরে হাজার হাতীর শক্তি ছিল। তাঁর নাক দিয়ে রক্ত বেরোল। তিনি কান্না কান্না ভাব করে বললেন, "ভীম, তোমার কি হয়েছে?"

কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, "রাজা আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনি ভীমকে চূর্ণ করেন নি, ভীমের একটি লৌহমূর্তিকে করেছেন।" এই মূর্তি গদাযুদ্ধ অভ্যাস করার জন্য দুর্যোধন তৈরি করিয়েছিল। তারপর কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিয়ে অনেক কথা বললেন। "পাণ্ডবরা ছাড়া এখন আর আমার পুত্র বলতে কে আছে।" বলে ধৃতরাষ্ট্র ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের গায়ে হাত বুলোতে লাগলেন।

মিত্র-ভেদ

আট

শেয়াল কাককে বক ও কাঁকড়ার কাহিনী শোনাল।

বক ও কাঁকড়ার কাহিনী

এক পুকুরের পাশে এক বক বাস করত। বকটা বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। তাই সে বিনা পরিশ্রমে বসে বসে খেতে চাইত। মনে মনে সে একটা ফন্দি এঁটে পুকুরের ধারে চুপ করে বসেছিল। মাছগুলো কাছে এসে চলে গেলেও সে কিছুই করত না।

মাছের সঙ্গে একটা কাঁকড়াও বাস করত ঐ পুকুরে। সে বকের কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, "মামা, মনে হচ্ছে কিছু হয়েছে, চুপচাপ বসে আছ যে?"

"দেখ, বহুকাল ধরে আমি মাছ খাচ্ছি। আরামেই ছিলাম। মাছ আমি খাই বটে তবে মাছ তো আমার বন্ধুও। আর বন্ধুর বিপদ মানেই আমার বিপদ। এই বুড়ো বয়সে আমি বোধহয় আর এখানে বসে বসে খেতে পারব না।" বক বলল।

"কেন মামা, কেন পারবে না?" কাঁকড়া জিজ্ঞেস করল।

"আজ সকালে কয়েকজন জেলেকে বলাবলি করতে শুনলাম। 'এটা বড় পুকুর! এক কাজ করা যাক। রোববারের ভিতর বাকি চারটে পুকুরের শিকার সেরে আমরা সোমবার এই পুকুরের মাছ ধরতে আসব। আমরা যে নতুন জাল বানিয়েছি তাতে মাছ তো বটেই অন্য কোন প্রাণীও পালাতে পারবে না।' আজকে সোমবার না? এই বুড়ো বয়সে আমার মুখের গ্রাস

শেষ প্রচ্ছদ চিত্র

চলে যাবে। আমি খাব কি ? বাঁচবো কি করে ?" বক বলল।

বকের কপট কথা শুনে পুকুরের মাছ ও অন্যান্য জলচর প্রাণী ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। এত ভয় পেল যে ওরা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বককে মামা কাকা জ্যাঠা দাদা বন্ধু প্রভৃতি নানা সম্বোধন করে বলতে লাগল, "আপনি যে আমাদের আগেভাগে এই বিপদের কথা জানিয়েছেন তার জন্য আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা করা আপনার পক্ষে মোটেই কষ্টকর নয়।"

"দেখ, আমি অণ্ডজ, আর মানুষ পিণ্ডজ। আমি কি মানুষকে কখন কোন ব্যাপারে টেক্কা দিতে পারি ? যাই হোক, তোমাদের রক্ষার ব্যাপারে একটা উপায় ভেবেছি। তোমরা প্রত্যেকে সহযোগিতা করলে আমার চেষ্টা সফল হতে পারে। এখান থেকে একটু দূরে একটা মন্দির আছে। মন্দিরের পাশে একটা পুকুর আছে। সেই পুকুরে পদ্ম ভরে রয়েছে। সেই পদ্মভরা পুকুরে মাছ ধরা নিষেধ। ঐ পুকুরে তোমরা নিশ্চিন্তে থাকতে পার। তোমরা ছোট ছোট দলে যদি আমার পিঠে চড়ে বস তাহলে আমি তোমাদের সেই পুকুরে নিয়ে যেতে পারি।" বক বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলল।

একথা শুনে মাছগুলো আনন্দে লাফাতে লাগল। প্রত্যেকে বকের প্রতি নিজের নিজের কৃতজ্ঞতা জানাল। বকও মনে মনে হাসল। ভাবল এভাবে মাছগুলোকে সহজেই খাওয়া যাবে। একথা ভেবে ঐ পাপী বক মাছের প্রার্থনা মঞ্জুর করল।

তারপর মাছগুলোকে নিয়ে বক মন্দিরের দিকে উড়ে গেল। কিন্তু সে যেখানে যাবার কথা বলেছিল সেখানে গেল না। গেল এক পাহাড়ী অঞ্চলে। সেখানে ফেলে মাছগুলোকে খেয়ে নিল।

সে এভাবে মাছ নিয়ে যায় আর খেয়ে নেয়। বেশ কদিন কাটল। কোন মাছের মনে কোন সন্দেহ জাগেনি কখনও। বক

মাছগুলোকে রেখে আসার নিত্য নতুন গল্প বানিয়ে বলে।

কয়েকদিন পরে কাঁকড়ার মনেও ভয় জাগল। জেলেদের মাছ ধরতে আসার দিন এগিয়ে আসতেই কাঁকড়া বকের কাছে এসে বলল, "মামা, আমাকে তুমি বাঁচাবে না ?"

বকেরও প্রত্যেকদিন মাছ খেয়ে খেয়ে একঘেঁয়ে লাগছিল, সে মনে মনে ঠিক করল কাঁকড়া খাবে। সে কাঁকড়াটাকে পিঠে বসিয়ে মন্দিরের দিকে এগিয়ে পরে সেই পাহাড়ী অঞ্চলে নাবল।

"মামা, ঐ মন্দির কোথায় ? সেই পদ্মফুলে ভরা পুকুর কোই ? "কাঁকড়া বককে বলল।

বক রসিকতা করে বলল, "এইতো এখানেই মাছগুলো শান্তিতে ঘুমোচ্ছে।"

কাঁকড়া বকের কথা শুনে উঁকি মেরে দেখে অবাক হয়ে গেল। মাছ নেই, আছে মাছের কাঁটা। তখন কাঁকড়া মনে মনে বলল, "এই পৃথিবীতে যারা বুদ্ধিমান তারা কেউ বন্ধু হয়েও শত্রুর মত অভিনয় করে আবার কেউ শত্রু হয়েও বন্ধুর মত অভিনয় করে। যারা শত্রু হয়েও বন্ধুর মত আচরণ করে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার চেয়ে সাপের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা অনেক ভাল। এত ভাল কথা শুনিয়ে এত মাছকে মেরে ফেলেছে বকটা ! এর বদলা নিতেই হবে। এবং এটাই মোক্ষম মুহূর্ত।" এই সব কথা ভেবে বক যখন কাঁকড়াটাকে নাবাতে গেল সেই মুহূর্তে কাঁকড়াটা বকের গলা জোরে জড়িয়ে ধরল। কাঁকড়ার ধারালো নখের আঁচড়ে বকের গলা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল।

তারপর বকের মাথা নিয়ে কাঁকড়া ঐ পুকুরে ফিরে এল। তাকে দেখে মাছ-গুলো জিজ্ঞেস করল, "কি ব্যাপার দাদা, ফিরে এলেন কেন ?"

কাঁকড়া বকের মাথা দেখিয়ে বলল, "এই পাজীটা আমাদের সবাইকে ধোকা দিয়েছে। এই পাপীর কথা বিশ্বাস করে

আমাদের এই পুকুরের অনেক মাছ মারা গেছে। আমি এ বিশ্বাসঘাতককে মেরে তার মুণ্ডু নিয়ে এসেছি। জেলেদের এখানে আসা বা আমাদের নতুন জালে ধরে নিয়ে যাবার যে সব কথা ঐ পাপীটা শুনিয়েছে সব মিথ্যা। এখন আর আমাদের কোন ভয় নেই। আমরা আরামেই এখানে থাকতে পারব।"

শেয়ালের মুখে এ-কাহিনী শুনে কাক বলল, "বন্ধু, আচ্ছা বলত, তাহলে এখন সাপকে কিভাবে মেরে ফেলা যায়?"

শেয়াল বলল, "তুমি কোন মন্দির অথবা পুকুরের কাছে অপেক্ষা করতে থাক। ধনীর কোন রত্নহার নিয়ে পালাও। লোকে তোমার পিছনে ছুটবে। ওদের দেখিয়ে তুমি ঐ রত্নহার সাপের খোপরে ফেলে দাও। লোকে ঐ খোপর খুঁড়তে শুরু করে দেবে। সাপ বেরুবে। সাপকে তখন ওরা মেরে ফেলবে।"

কাক বাসায় ফিরে গিয়ে তার বউকে বলল সব কথা। দুজনে তাড়াতাড়ি উড়ে গেল রাজমহলের কাছের পুকুরে। কিছুক্ষণ পরে রাণী ঐ পুকুরে স্নান করতে এল। রাণী রত্নহার ঘাটে রেখে স্নান করতে লাগল। মাদি কাক ঝট করে ঐ রত্নহার তুলে আস্তে আস্তে উড়তে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে হৈচৈ পড়ে গেল। পাহারায় যারা ছিল সেইসব রাজকর্মচারী কাকের পিছনে পিছনে হৈচৈ করতে করতে ছুটতে লাগল।

মাদি কাক রত্নহারটাকে সাপের গর্তে ফেলে দিয়ে উড়ে গাছের ডালে বসে মজা দেখতে লাগল। রাজকর্মচারীরা রত্নহারের সন্ধান করতে করতে সাপের গর্ত খুঁড়তে লাগল। রাগে সাপ গর্ত থেকে বেরোতেই ওরা সাপটাকে মেরে ফেলল এবং রত্নহার নিয়ে রাজমহলে ফিরে গেল।

এইভাবে কাক সাপের বিপদ থেকে বাঁচতে পারল।

আমেরিকায় রাশিয়ার গির্জা

অলাস্কার (উত্তর আমেরিকার) একটি অংশ রাশিয়ার অধীনে ছিল। সিট্‌কা নামক অঞ্চলে রাশিয়ার আবিষ্কারকরা এই গির্জা তৈরি করেছিল এবং সিট্‌কাকে অলাস্কার (রাশিয়ার) রাজধানী করেছিল। এই গির্জা ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তৈরি করা হয়েছিল। ১৮৬৭-তে আমেরিকানরা অলাস্কাকে কিনে নিয়েছিল অলাস্কা আমেরিকার ৭৯তম রাজ্য হল।

ফটো : শর্মা স্টুডিও—ভিলওয়ারা
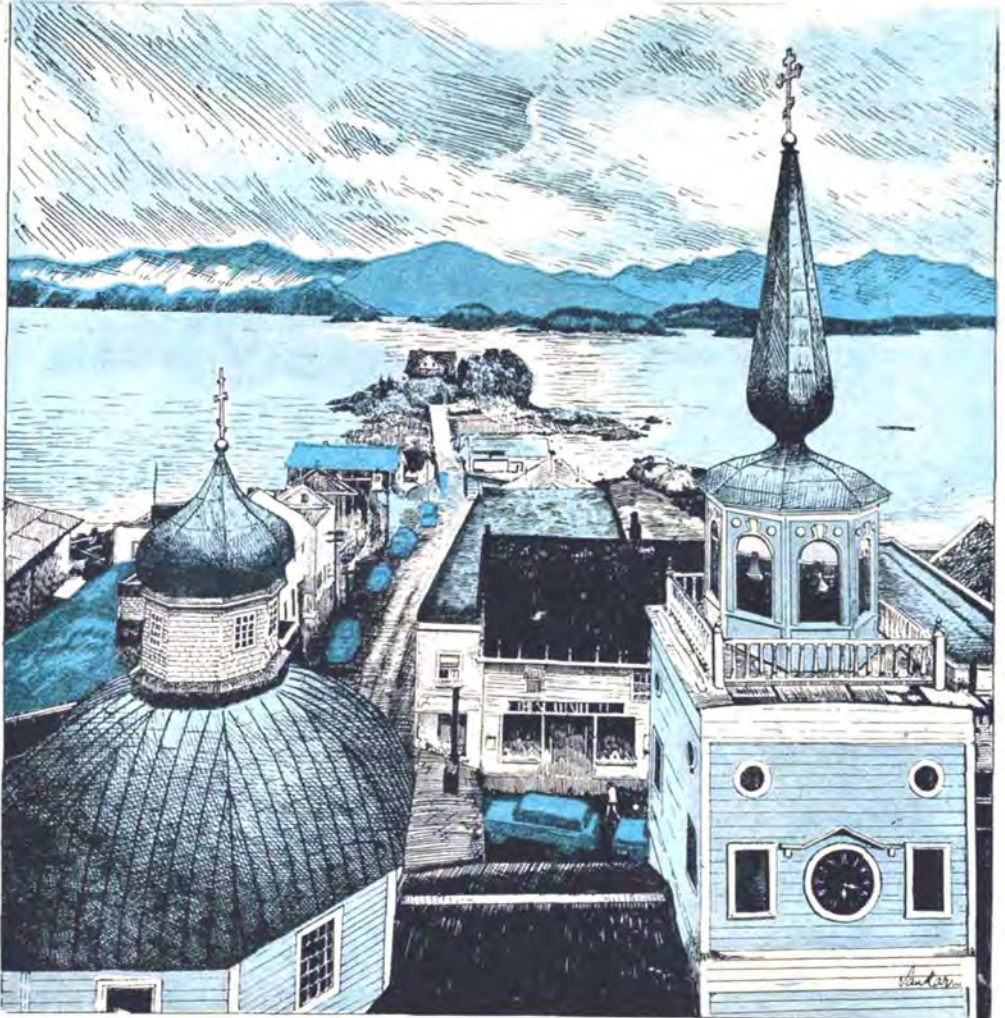
পুরস্কৃত নাম

খাবারের জন্য সংগ্রাম

পুরস্কার পেলেন তারাপদ সেনগুপ্ত

ফটো : পাসালা কৃষ্ণকুমার

৭।২৮ পোদ্দার নগর,
যাদবপুর কলিকাতা-৩২
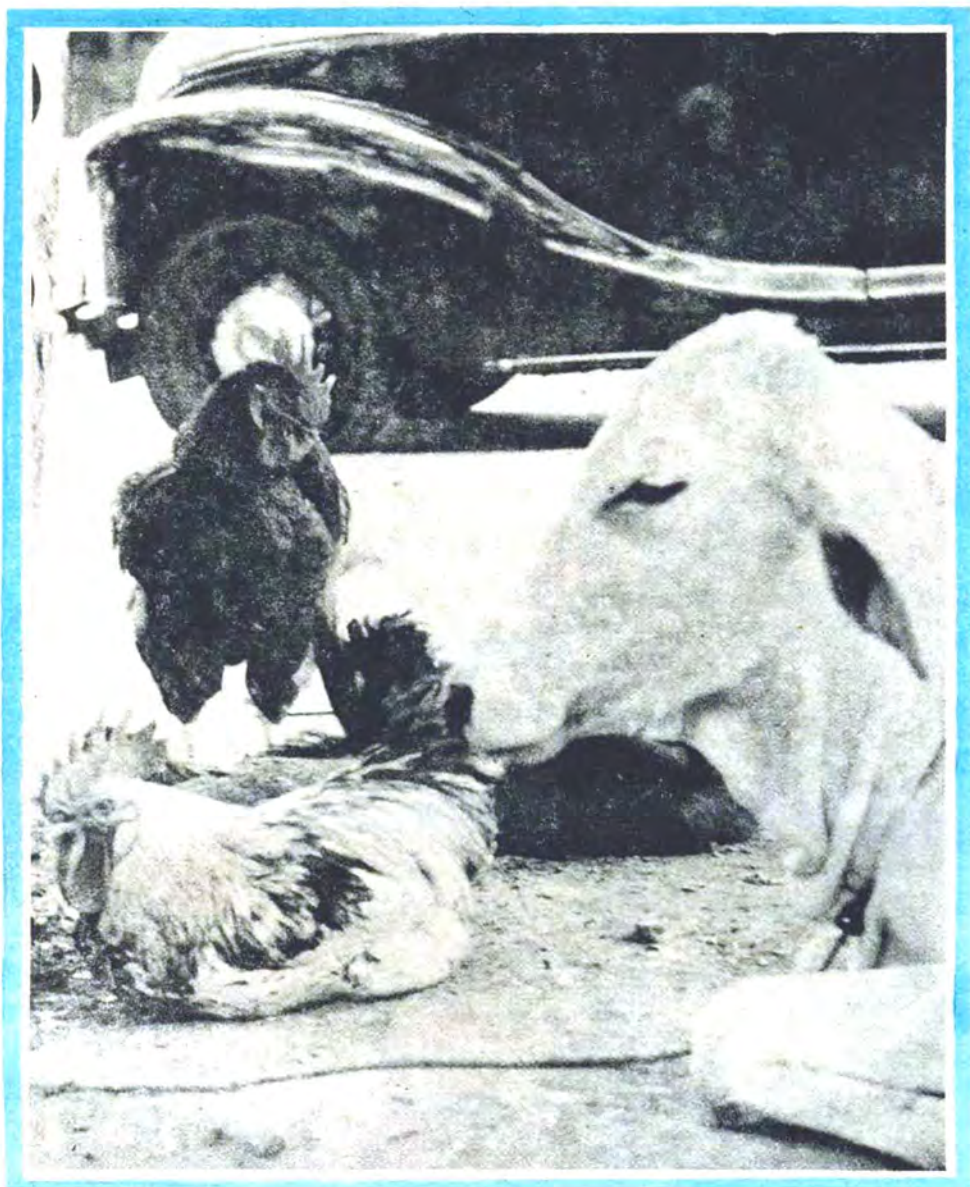
তারপরেই চাই বিশ্রাম

পুরস্কৃত
নাম

ফটো নামকরণ প্রতিযোগিতা ঃঃ পুরস্কার ২০ টাকা

★

* ফটো-নামকরণ ২০শে এপ্রিল '৭৪-এর মধ্যে পৌঁছানো চাই।
* ফটোর নামকরণ দু চারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং দুটো ফটোর নামকরণের মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই। নিচের ঠিকানায় পোস্ট-কার্ডেই লিখে পাঠাতে হবে। পুরস্কৃত নাম সহ বড় ফটো জুন '৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

চাঁদমামা

এই সংখ্যার কয়েকটি গল্প-সম্ভার

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

বীকানীর ফোর্টের ভিতর

তৃতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

যন্তর-মন্তরের ভিতর

Printed by B. V. REDDI at The Prasad Process Private Ltd., and Published by B. VISWANATHA REDDI for Chandamama Publications, 2 & 3. Arcot Road, Madras-600026. Controlling Editor 'CHAKRAPANI'

Photo by: **B. BHANSALI**

CHANDAMAMA (Bengali) APRIL 1974 Regd. No. M. 9100

মিত্রভেদ